ঘরের ছেলে বাহিরে

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে

ধনগোপাল

New York, July 15, 1936.

Mr. Dhan Gopal Mukherji, lecturer, writer and author of the book entitled "A Son of Mother India Answers", which replies to Miss Katherine Mayo's "Mother India", was found hanged in his Manhattan apartment by his American wife.

Mr. Mukherji, aged 45, had a nervous breakdown some weeks ago, said to be due to overwork.

Reuter.

মৃত্যু আসে অনেকের জীবনে চরম সম্মানের শিরোভূষণের মত। সে এক পরম গৌরব! এক হাতে চোখের জল মুছে, অপর হাতে আত্মীয় অনাত্মীয় শ্রদ্ধানুবিদ্ধ মানুষ বিরাটের শেষ সজ্জা রচনা করে আড়ম্বরে, তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করে সমারোহে।

ধনগোপালের অন্তিম প্রয়াণ এনেছে যে দুঃখ, চরম বঞ্চনার মধ্যেই তার উদ্ভব। মনের মধ্যে কেবলই যেন পরাজয়ের লজ্জা জেগে ওঠে। সুচিরকালের মধ্যে যাকে স্থির মনে বসিয়ে রেখেছিলাম, রাত্রি প্রভাতে তার আকস্মিক অন্তর্দ্ধান যে বেদনা দেয় তা যেন শোকেরও অতীত।

অথচ প্রাণপ্রাচুর্য্যের আঢ্যতায় ধনগোপালকে দুঃখের অপরিচ্ছন্ন আঙ্গিনায় কল্পনা করা দুঃসাধ্য। স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথের পরে পরিপূর্ণ জীবনপ্রীতি যদি কোথাও দেখে থাকি—সে এই ধনগোপালের। সে প্রীতি ক্ষণিকের উৎসাহ নয়—প্রথম যৌবনের স্বপ্নভরা উচ্ছ্বাস নয়—সে ছিল ধনগোপালের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্মের উৎস, জীবনের সোনার কাঠি।

চঞ্চল ও দীপ্ত—সুস্থ সুন্দর প্রাণের প্রতীক—ধনগোপালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত্তে তাঁর এই রূপই দেখেছিলাম। প্রথমে প্রণয়ের ভীরুতা কাটিয়ে তরুণ প্রেমিক যেমন তন্ময় হয়ে যায়, তনু-মন-প্রাণ দিয়ে প্রিয়জনকে পাবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, জীবন-প্রেমিক ধনগোপালের সেই হৃষ্ট উল্লসিত রূপই আজ বারংবার মনে আসছে। স্বার্থসিদ্ধির গর্ব্ব নয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠার দাম্ভিকতা নয়, তাঁর সকল বচনে-ব্যবহারে দেখেছিলাম আত্মপ্রসারের ও আত্মপ্রকাশের অপরূপ আগ্রহ, সার্থক প্রয়াসের নিরহঙ্কার উল্লাস ও তৃপ্তি।

প্রথম পরিচয়ের নিদাঘ সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে।

আসতে আমার সামান্য দেরী হয়ে গেল। ঘরের পাশের পথ থেকে শুনছি শুদ্ধ ইংরেজীতে কে প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করছে—চরম আত্মোৎসর্গের উল্লাস সে কবি-কথায় ব্যঞ্জিত—সুললিত কণ্ঠ ভাবাবেগে মধুবর্ষণ করছে। ঘরের দেওয়ালে হারিকেন লণ্ঠনের আলো-অন্ধকারে সচল ছায়া বিচিত্র ছবি সৃজন করে চলেছে।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি—শ্যামসুন্দর কান্তি ধনগোপাল ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি করছেন আর দাদা* জানলার কাছে প্রীতিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে—বার বৎসর পরে হারানো বন্ধুকে কাছে পেয়ে তাঁর আনন্দ যেন বাণীর সীমার মধ্যে আর ধরা দিচ্ছে না।

দাহ নেই কেবল অপূর্ব্ব দীপ্তি—ধনগোপালের মনীষার এই বিশেষত্ব আমাকে মুগ্ধ করল। কথার পরে কথা—অনর্গল, অশেষ—কিন্তু কোথাও এমন তীব্রতা নেই যা মানুষকে সামান্য মাত্রও ব্যথা দিতে পারে।

কথায় কথায় পরিচয় পেলুম। কলকাতার কাছে কোন একটি ছোট গ্রামে ধনগোপালের জন্ম। ষোলবছর বয়সে এখানকার স্কুলের শিক্ষা

---

* ৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জাপানে উভয়ের পরিচয় ও প্রণয়—যা দীর্ঘ অদর্শনেও অম্লান।

শেষ করে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যন্ত্রবিদ্যা শিখে স্বদেশ, স্বজাতিকে পাশ্চাত্যের ন্যায় সভ্য ও সমৃদ্ধ করবার কল্পনায় তিনি একদিন ভারতের কূল ত্যাগ করে সমুদ্র পার হয়ে উপস্থিত হলেন জাপানে। পরিচয়হীন সম্পদহীন তরুণ ছেলেটির ছিল শুধু মানুষকে ভালবাসার ও ভালবাসাবার মোহিনী শক্তি আর দুর্দ্দম জ্ঞান-পিপাসা। কিন্তু যন্ত্রের চেয়ে মন্ত্রে তাঁর ব্রাহ্মণসুলভ বিশ্বাস ছিল বেশী। হাতুড়ীর চেয়ে কলমই তাঁর হাতে চলল ভাল। কারখানার রুদ্ধ বাতাস ছেড়ে তিনি নামলেন পথে। এঞ্জিনিয়ার না হয়ে তিনি হলেন কবি। জাপান থেকে এগিয়ে গেলেন আমেরিকায়।

আকাশে, মাটিতে ও জলে তিনি নতুন পথ খোলেননি কিন্তু কবির অন্তরে ছিল যন্ত্রী! তাই, তাঁর সাধনা হ'ল অপূর্ব্ব এক সেতু রচনার। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মনের আকাশে আছে অপরিচয়ের যে বিরাট ব্যবধান, ভাবের খিলান দিয়ে তিনি রচনা করতে চাইলেন—চির-কালের এক সেতুবন্ধ। অজ্ঞানতাজাত অবিশ্বাসের ছিল যে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর, সেখানে তিনি রচনা করতে চাইলেন মনের আনাগোনার অসংখ্য পথ।

মার্কিনকে যেমন তিনি তাঁর সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে জানবার চেষ্টা করেছেন, ভারতকে জানাবার চেষ্টাও ছিল তাঁর প্রাণপণ সাধ্য। নিঃসম্বল ও নির্ব্বান্ধব ধনগোপাল নিজগুণে আমেরিকায় সম্পদ ও সম্মান লাভ করেছেন—সেখানে তিনি 'জাতে' উঠেছেন। মার্কিন জননায়ক উড্রো উইলসন প্রভৃতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও বহু শিষ্য ও বন্ধুর অজস্র আদরের মাঝখানে দেশকে, নিজের জাতিকে তিনি ভুলে যাননি—তাদের মহত্ব প্রচার করে তিনি নিজেই যে গৌরবান্বিত—একথা সব সময়ে তাঁর মনে জেগে থাকত।

সে সন্ধ্যায় সবচেয়ে আমাদের ভাল লাগল তাঁর অবিমিশ্র 'বাঙালীপণা'। ধনগোপালের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে অনেক

'বিলাত ফেরত' শিক্ষিত বাঙালী ও অবাঙালীর সংস্রবে আসবার সুবিধা হয়েছে, কিন্তু 'ফেরত' হলেও তাঁরা যে 'বিলাত ফেরত' একথা ভোলা শতের মধ্যে নিরানব্বই জনের পক্ষেই দুঃসাধ্য ছিল। কাজেই তাঁদের সঙ্গে আহার-বিহারে আমরাও সে কথা ভুলি কেমন করে?

আধ-ময়লা একটা শার্ট ও ধুতি, অজস্র সরল কথা, হৃদ্য সম্ভাষণ, অকুণ্ঠ ব্যবহার—অল্পক্ষণেই বুঝিয়ে দিল যে এ মানুষটি আমাদের আত্মার আত্মীয়।

ভারতে আসবার পথে ধনগোপাল ইংলণ্ডে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সভায় বক্তৃতা দিয়ে ও সেখানকার বিখ্যাত মনীষীদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক পাতিয়ে এসেছেন; বার্নার্ডশ, বারট্রাণ্ড রাসেল, এইচ. জি, ওয়েলস্—আমাদের কৌতূহলের আর অবধি নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছি। আর ঠিক সেই আগ্রহ ও কৌতূহলে ধনগোপালের বিদেশের গল্প বলতে আর যেন মন সরছে না, যতটুকু সময় হাতে আছে দেশের কথা—দেশবাসীর পরিপূর্ণ পরিচয় নেবার তাঁর উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, পরম ব্যাকুলতা।

নিউ ইয়র্কে বাসা বাঁধলেও তাঁকে সারা আমেরিকা বক্তৃতা দিয়ে ঘুরতে হয়—এভাবে দারুণ পরিশ্রম করেন দুই উদ্দেশ্যে।—এক অর্থোপার্জ্জন আর এক ভারতের কথা জনসাধারণ্যে প্রচার। তাঁর জনপ্রিয়তা ও শিক্ষার যশ মার্কিন ছাড়িয়ে ইউরোপে এসে পৌঁছেছিল, তা না হলে ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে নিমন্ত্রণ আসত না। এর মধ্যে অর্থলোভহীন কবিযশাকাঙ্ক্ষায় তিনি লিখতেন কবিতা। কাজেই সময় খুবই অল্প। তবু যেটুকু অবসর, তিনি কলকাতা থেকে বাঙলা বই এবং সংবাদ ও সাময়িক পত্র সংগ্রহ করে প্রাণের যোগ অক্ষুণ্ণ রাখতেন।

আজ বাঙালীর ঘরে এসে ধনগোপাল যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। নির্ব্বাধ 'বাঙালীপণা' করবার সে আনন্দ আমাদের মধ্যেও চারিয়ে গেল—'সাহেবজনে'র কাছে শেখা 'কেতা-দুরস্ত' ব্যবহার আমরাও ভুললাম।* খাবার ঘরে এসে ধনগোপাল বল্লেন—"বাঃ! কলাপাতা কই—এ কি, মাংস কেন? ভাত, মাছের ঝোল আর দই?" হঠাৎ বোধ হয় মনে পড়ল, বল্লেন—"সুরেশ, ছ্যাঁচড়া দেবে না?"

এক একবার যে সন্দেহ হয়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত তাঁর প্রতি কথায় ও ব্যবহারে এবং বিশেষ করে প্রত্যেক চিঠিতে বুঝেছি যে, দেশপ্রীতির এ উচ্ছ্বাস, উল্লাস ও উৎসাহ ধার করা নয়—আন্তরিক বোধের সরল অভিব্যক্তি।

ধনগোপালের সঙ্গে তাঁর মার্কিনী স্ত্রী এসেছিলেন। শান্ত নিরভিমানিনী হাস্যময়ী নারী। ধনগোপালের মত তিনিও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং শিশুপ্রীতি বশে নতুন ধরণের শিশুশিক্ষালয় সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিতা।

ধনগোপালের পরমাত্মীয় ও আত্মীয়ারা বোধ করি তাঁকে ভাল করে জেনে বুঝে বলেছিলেন—"যেনেষ্টং তেন গম্যতাং।" কোথাও কোন বাধা জাগেনি—বিদেশিনী বধূ সম্বন্ধে কোন আপত্তি ছিল না তবু প্রাচীন সংস্কার বশে তাঁর এক নিকট আত্মীয়া ধনগোপালের কল্যাণ-কামনায় আয়ুষ্মতীর চিহ্ন-স্বরূপ বধূর বাম হাতে একগাছি 'লোহা' পরিয়ে দিয়েছেন।

তিনি হাসিমুখে সেই "সাবিত্রী লোহা" আমাদের দেখাচ্ছেন, এমন সময় ধনগোপাল কবিতা সম্পর্কিত একখানি মাসিকপত্র হাতে

---

* সে সময় সেই বাড়ীতে যাঁরা থাকতেন তাঁদের উল্লেখ বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ছিলেন ৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺সরোজকুমারী দেবী, শ্রীমতী সুরমা দেবী, ৺রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী ফ্রিডা দাস এবং প্রবন্ধ লেখক।

নিয়ে সে ঘরে এলেন। তাঁর আট লাইনের ছোট একটি কবিতা সে সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। পরম আগ্রহে স্ত্রী স্বামীকে পড়তে বল্লেন, তারপর আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বল্লেন—উনি চমৎকার আবৃত্তি করেন।

ধনগোপাল কবিতা পড়ছেন আর তাঁর বিদেশিনী পত্নী মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে আছেন—পাঠ শেষে তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠল পরিতৃপ্তির শান্ত হাসি—সে ছবি আজও মনে আছে।

জন্মকবি হলে কি হয়, ধনগোপালের মনে বা কর্ম্মে কোথাও বিশৃঙ্খলা ছিল না। অসংখ্য কাজ নিয়ে এসেছিলেন, ব্যস্ত হয়ে তা সমাধান করে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। আত্মীয়তার যে বন্ধনের সূত্রপাত হ'ল, পত্রালাপের টানাপোড়েনে সে বন্ধন দৃঢ় বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করল। মানুষটি এমনি আত্মস্থ ও পরিণত যে, যে কোন একখানি চিঠি থেকে তাঁকে অনেকখানি জানা যায়। বক্তব্যের গতি যেমন বৃষ্টিধারার মত সহজ সরল তেমন অমলিন। ধনগোপালের হৃদয়ে কোথাও কৃপণতা ছিল না। সহজ ঔদার্য্যে তিনি প্রত্যেকের বন্ধু। হাসিমুখে প্রাণ খুলে যে কথা কয়েছে, প্রত্যেকেই তাঁর কাছে "Jolly good fellow."

যেদিন তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয় হ'ল—সেদিনও দেখলাম অখণ্ড এই মানুষটি সহজ লীলায় নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। আর প্রকাশ পেয়েছে আন্তরিক দেশপ্রীতি। ছোট ছেলেদের জন্য লেখা তাঁর 'Jungle Beasts and Men' পড়ে সেই কথাই তাঁকে লিখেছিলাম। প্রশংসার 'পুরস্কার' স্বরূপ উপহার পেলাম, 'Kari the Elephant' ও 'Cast and Outcast'.

জগতের যে-কোন ভাষায় 'Cast and Outcast' সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। পুস্তকের প্রথম অংশে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের

কাহিনী বলার ছলে মার্কিনের পাঠকের কাছে ভারতের গৌরব কাহিনীই ব্যক্ত করেছেন। দ্বিতীয় অংশে আছে তাঁর মার্কিনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। 'তরুণের অভিসার' নাম দিয়ে ১৩৩১ সালে সাময়িক পত্রে এই অংশের অনুবাদ ধারাবাহিক প্রকাশ করেছিলাম।* এযাবৎ তাঁর আর দুখানি বই বাংলায় অনূদিত হয়েছে—কিশোরদের জন্য লেখা হলেও বয়স্কদের রসবোধ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে, ধনগোপালের রচনা সম্বন্ধে এ অপবাদ মিথ্যা। অনুবাদক ৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তক দুখানির নাম 'চিত্রগ্রীব' (Gay Neck) ও 'যূথপতি' (Chief of the Herd)।

তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে ধনগোপালের কবি মন অপূর্ব্ব ভাব-বৈচিত্র্যে নিজেকে উদ্ঘাটিত করেছে। সমস্ত ব্যাপারটাই মৌলিক ও অভিনব। এ মৌলিকতা একটা 'নতুন কিছু' করার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা নয়—বোধের পরিচ্ছন্নতা, আন্তরিকতা, সত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের একাগ্রতা। দুটা মহাদেশকে জানবার চেষ্টা তাঁর কতদূর সার্থক হয়েছে, ধনগোপালের রচনাবলীর পাঠকেরা তার বিচার করবেন। অপিচ, এদেশ না হলেও আমেরিকা ও ইংলণ্ডে সে বিচার বহু পূর্ব্বেই হয়ে গেছে এবং সেই দুই দেশেই রসিক পাঠক-সমাজে তাঁর রচনা পরম আদরের সামগ্রী।

সাহিত্য-সাধনার অন্তরবস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে একখানি পত্রে তিনি লিখেছেন :—

"If I were to criticise our modern Calcutta lads and lasses, I should say that they are wasting their impressionable years. What they need is saturation in Life and with life. Instead, our intelligentsia know

* "ঘরের ছেলে বাহিরে" "তরুণের অভিসারের নামান্তর।"

books. Life is not in books. An Indian peasant living in the Jungle country knows more and masters more terrible experiences than any monkey of an M. A. man whose degrees are but a tail behind him.

Tagore and Sarat Chatterjee grip me because they are not College-bred asses but master observers who have lived with heart, soul and mind open."

শুধু বই লেখবার জন্য নয়, জীবনকে সমগ্রভাবে বোঝবার জন্য সংসারকে গ্রহণ করবার তাঁর শক্তি ছিল প্রচুর। কোন কিছুতেই দমবার মানুষ তিনি ছিলেন না। নিত্য জীবনের ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি কোন দিনই তাঁকে বিচলিত করেনি—অসীমের সুরে-বাঁধা জাগ্রত একটি মন বারে বারে তাঁর রচনায়, কি পুস্তকে, কি পত্রে, নিজেকে প্রকাশ করেছে। যদি কোনদিন আমাদের মনের গোপন দুর্ব্বলতা পত্রের মধ্যে ধরা পড়েছে, ভর্ৎসনা করেছেন, উৎসাহিত করেছেন—উপনিষদের বলিষ্ঠ সান্ত্বনার সন্ধান দিয়েছেন।

আর একবার লিখেছেন,—But when I take up the Geeta and follow its stately poetry or study the Brihad-aranyaka, I feel assured that—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

প্রথম পরিচয়ে যেমন জেনেছিলাম—বছরে বছরে তাঁর নতুন নতুন বই পড়ে সেই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে। তাঁর বলিষ্ঠ জীবন-প্রীতি মাটির বুকে নদীর সীমাসমন্বিত রৌদ্রদীপ্ত রজতধারার মত সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। ভয় নেই, বিরোধ নেই, দ্বন্দ্ব করে জয়ের আকাঙ্ক্ষা নেই—আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের বিরাট তৃপ্তি ও দাক্ষিণ্য বারে বারে তাঁর রচনায় রূপ নিয়েছে।

সংশয়ী বলতে পারেন যে, মনের মণিকোঠায় বসে এ সবই সম্ভব কিন্তু তারপর দেওয়ালের বাইরে মানুষের ভিড়ে তিনি কি করতেন? জ।বনের মাহেন্দ্রক্ষণ দিয়ে মানুষকে ত সম্পূর্ণ বিচার করা চলে না, প্রতিক্ষণের আলোছায়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই মানুষকে যাচাই করাই উচিত।

কথাটা অস্বীকার করছি না, অনেকেই কববেন না। কিন্তু বিচারের কথা বা যাচাই করবার কথা ত মনে আসছে না। শুধু জানি, যতটুকু দেখেছি এ জীবন-প্রীতির ব্যত্যয় দেখিনি। সেই 'nihil humani a mialienum puto'—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—শিশুজনোচিত দারুণ কৌতূহলবশে অনুসন্ধানের ইচ্ছায় নয়, বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের বলে তিনি জীবনকে অঙ্গীকার করতেন। এই স্বীকৃতির মূলমন্ত্র তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদ-মালায়। তাঁর ধ্যানের বস্তু ছিল রুদ্রের দক্ষিণ মুখ।

এবং অঙ্গীকার তাঁর পক্ষে সহজ ছিল বলে নিত্য জীবনের চলা-ফেরা কোনদিন আড়ষ্ট ছিল না। প্রথম বর্ষা নেমেছে,—সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত করে ঝম ঝম করে বৃষ্টি ঝরছে, নিউ ইয়র্কবাসী ধনগোপাল কলকাতার ছোটগলিতে হারিকেল-জ্বালা স্বল্পালোকিত সজ্জাবাহুল্যহীন এক ঘরের জানালায় বসে ভেরল্যাঁ আবৃত্তি করছেন, ফরাসী ও তার ইংরেজী অনুবাদ—

"It is raining in the city
It is raining in my heart."

... ...

স্নেহভাজন রতীন হঠাৎ ঘরে ঢুকল: কাব্যের চেয়ে ফুটবলে তার রুচি তখন অনেক বেশী। কাব্যামোদী যুবক অবিলম্বে ফিরলেন কৈশোরের কোঠায়। আশ্চর্য্য, কোন কিছুই তাঁর বাধত না, যে যেমন, তাকে তার মত স্থান নির্দ্দেশ করতেন কত সহজে। কৃতকর্ম্মা মানুষের

অনাবশ্যক 'ভারিক্কী' চাল তাঁর দুচক্ষের বিষ। তাই খুনসুড়ি দুষ্টমি করতেও যেমন, সাহিত্য ও জীবনবিচারেও তেমন, আর মনের গোপন রহস্যের সন্ধান দেওয়া-নেওয়া ব্যাপারেও তেমন—ঘর থেকে ঘরে স্বচ্ছন্দে যেন আনাগোনা করছেন—সদাজাগ্রত নিত্যপ্রস্তুত অবস্থা।

যেমনি সাক্ষাৎ ব্যবহারে, তেমনি চিঠিতে কোন সময়েই তাঁর অন্তরের মানুষটির কোন বৈলক্ষণ্য দেখিনি। অকৃপণ ধনগোপাল এদেশ থেকে ফিরে গিয়ে বইএর পরে বই, আর চিঠির পর চিঠি পাঠিয়েছেন—কখনও প্রশ্ন তুলেছি, কুতর্ক করেছি এবং প্রয়োজনে আক্রমণ করতে দ্বিধা করিনি। সমস্যার সমাধান দিয়েছেন, পরিহাস করেছেন, আর আপন জেনে পরামর্শ দিয়েছেন। অথচ গুরুজন সাজবার কোন আগ্রহই তাঁর দেখিনি। পাছে কথা ভারী হয়ে উঠে তাই অনেক সময় ছোট্ট একটি পরিহাসে তার ভার কেটেছেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সুরেশবাবু 'জন্ম-নিরোধের' আলোচনা তুললেন 'ভারতীতে'। তর্ক বাধল। জানলুম মন্ত্রণাদাতা ধনগোপাল—প্রধান দুর্গে আক্রমণ চালালুম। জবাব এল—'You have laid on me a heavy hand. You ask me to defend birth control. I am not an ass, nor a barrister; I can't defend truth. পরে জন্ম নিরোধের যৌক্তিকতা দেখিয়ে পরামর্শ দিলেন—"As a literary man you should not argue. It is for men who are really quadrupeds, not for poets who have wings."

ব্যস তর্ক শেষ। "Now that we have disposed of birth control, let us get on to things that matter. I don't see much of India here. So I hunger for news of you—your soul particularly."

"Your soul."—ধনগোপালের এই ছিল তৃষা—এই ছিল সাধনার সামগ্রী। প্রবাসের বন্ধন যত বেশী ও যত কঠিন হয়ে উঠেছে, ভারতের টান যেন ধনগোপালকে তত বেশী চঞ্চল করে তুলেছে। প্রতি পত্রেই এক আবেদন 'তোমাদের কথা বল—দেশের কথা বল।' অবিরত বাংলা বই, বাংলা সংবাদপত্র সংগ্রহ করেছেন দেশের মন জানবার চেষ্টায়—প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ করে উপনিষদ পড়েছেন। চিঠিতে তার পরিচয় পেয়েছি অনেক রকমে—

"I simply feel awful when I see youngsters like you studying stupid stuff like "অভিজ্ঞানশকুন্তলং" in college when the richest poetry in the world—the Upanishads can be inculcated in you more easily."

আর একখানি পত্রে—

"Are you taking Sanskrit? You ought to, since you are a Brahmin lady."

অহং অস্মি প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব্বং দেবেভ্যোঃ।
অমৃতস্য না ভায়ি ॥

That is what a Brahmin lady should say to herself. For God's sake read the Upanishads in Sanskrit. Begin with Svetasvatara. It is the simplest."*

যখন জানালাম যে আমরা উপনিষদ পড়বার চেষ্টা করছি, সেদিন তাঁর কি আনন্দ। লিখলেন "Read and blunder your way through them."

নিজে উপনিষদ পাঠ করে, বন্ধুজনকে পড়বার পরামর্শ দিয়ে ধনগোপাল তৃপ্ত হতে পারলেন না। তিনি ঈশ, কেন, শ্বেতাশ্বতরো

* শ্রীমতী সুরমা দেবীকে লিখিত

প্রভৃতি গ্রন্থের গদ্যানুবাদ ইংরেজীতে প্রকাশ করেছেন। তাঁর "Devotional Passages from the Hindu Bible" মার্কিন শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদর লাভ করেছে।

বস্তুতঃ ভারতকে জানবার ও জানাবার চেষ্টা তাঁর যেন নেশা হয়ে উঠেছিল। আমরা এখানে বসে পশ্চিমের সঙ্গে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব ও পরাজয়ের বিক্ষোভে ভারতের কথা ভুলছি—অনেক সময় না ভুলেও যেন উপায়ান্তর নেই। আর হাজার হাজার মাইল দূরে বিদেশী সভ্যতার মধ্যে বাস করে ধনগোপাল আমাদের কথা ভাবছেন। হয়ত দূর বলেই, ব্যবধান আছে বলেই এ বিরহবোধ তাঁর মনে নিরন্তর জাগত; হয়ত অস্পষ্ট স্মৃতির রঙ্গিন মোহে ভারতের সব কিছুই তিনি বিচিত্র করে গৌরবান্বিত করে দেখতেন (কেউ কেউ তাঁর রচনায় এই কারণে অবাস্তবতার সন্ধান পেয়েছেন বলে অনুযোগ করেন)—কিন্তু ধ্যানের বস্তু কোন দিন কি রংয়ের মায়া এড়াতে পেরেছে? এ বিচিত্রতা, এ অপরূপত্ব বাদ দিয়ে কোনদিন বিরাট সাহিত্য, প্রকৃত শিল্প সম্ভব হয়েছে কি ?

অপিচ কেবল ধনগোপালের কাব্য সাহিত্য নয়, তাঁর জীবনের কথাই যদি ধরি, সেখানে দেখি এই ভারত সম্বন্ধে একটা বিচিত্রতা-বোধ ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিগ্রহ করছে। তাঁর দেখার ভঙ্গী অপরূপ। গয়া কংগ্রেস ঘুরে এসে সুরমা দেবী ধনগোপালকে সে কথা জানিয়েছেন! ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia) থেকে ধনগোপাল লিখলেন :—

"So Bodh Gaya gripped you. Well, I hope, I always hope, it is my desire that you felt the Buddha's presence there. The old, old India, that is what matters, the present India is a nightmare. Too much progress, too little grandeur in it. So, tell me, did you feel

Him, Buddha Tathagata, Mother India's tallest son, our elder brother, in that forest of a Congress? Was He in Gaya, He our brother and Comforter? Think of it my child. Buddha was our brother!" বুদ্ধদেবের কথা পারিবারিক এক পত্রে বারংবার উল্লেখ করেও ধনগোপালের তৃপ্তি নেই—আবার লিখেছেন—Where else, and where else is India's soul if not with Him, our Prince of Peace? Did you know Him, the Face of Eternal Compassion?"

"Did yon feel Him?" ধনগোপালের এই বারংবার পৃষ্ট প্রশ্নের উত্তরে কোনদিন তাঁকে বোঝাতে পারিনি যে সে বোধের শক্তি ও সাহস আমরা বহুদিন হারিয়েছি। বলতে পারিনি যে বুদ্ধ-শিষ্যত্ব এদেশে বিষম দলাদলির জিনিস। যে চরিত্র ও মনন থাকলে এ বোধ সম্ভব, ধনগোপাল তা লাভ করেছিলেন কিনা জানি না, এই কেবল বুঝেছি, যে আবহাওয়ায় বাস করলে এ বোধের সাধ জাগে, তিনি নিজের চিত্তলোকে তা সৃজন করে রেখেছিলেন। বাহির ভুবন সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে নয়, তাকে অস্বীকার করে নয়, তার সঙ্গে বিরোধ না করে। স্বভাব ও স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি সত্য ধারণা পোষণ করতেন—'ভাবের ঘরে চুরি' করবার সেজন্য তাঁর কোনদিন প্রয়োজন হয়নি—সে ধারণা মনে জাগেনি।

এই স্বভাব ও স্বধর্ম্মের ব্যত্যয় কোনদিনই ধনগোপালের ভাল লাগত না। এমন কি সে সময় যে আমরা বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ করতাম, রচনার প্রশংসা করে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন: "You have translated enough. Now look at Life around you and create likenesses to it. There must be an epic of the awakened Indian youth in you.

Why not bring it out?" "ননি প্রারভ্যতে খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ।"

এই বিঘ্নভয় কোনদিনই ধনগোপালের কর্ম্মশক্তিকে আড়ষ্ট করেনি, কোন ভয়ই কোনদিন তাঁকে কোন নীচতায় বা সামান্যতায় প্রবৃত্ত করেনি। উপনিষদাশ্রিত জীবনের এক কঠিন নির্ভিকতা ছিল যেন তাঁর দীপ্তি। কত কথায় যে তাঁর সে পরিচয় পেয়েছি।

ভারতে আসবার সময় একমাত্র শিশু-সন্তান নবগোপালকে সঙ্গে আনা সম্ভব হয়নি। আমাদের কৌতূহল তাই তাকে আশ্রয় করে থাকত। বারংবার তার কথা জিজ্ঞসা করতাম। একবার ধনগোপাল লিখলেন—

"Our boy Gopal is fine and fearless. Sometimes I think the fellow is a sort of সণ্ডামার্ক (?)।"

"Fearless"—কেবল মনের নয়, এ ভয়হীনতা তাঁর আত্মার পরিচয়। ষোল বছর বয়সে ঘরের মায়া ছেড়ে ধনগোপাল মার্কিন জয় করেছেন, বিদেশী বিধর্ম্মী মনে ও আত্মায় প্রভাব বিস্তার করেছেন, সে শুধু আত্মবলে। কি জানি কে তাঁকে নিত্য শোনাত এই মাভৈঃ মন্ত্র? জানি না কে তাঁকে পরিয়েছিল অভয় কবচ! কিন্তু জীবনসাধনার কোন শ্মশানে হারিয়ে গেল সে কবচ, ব্যর্থ হ'ল সে মন্ত্র?

একদিন তিনি লিখেছিলেন—

"Do not run away from your task; you will live a hundred years by taking up your own work. This is the Path, there is none other,"*

আজ ধনগোপালকে একথা কে স্মরণ করিয়ে দেবে?

---

*Devotional Passages from the Hindu Bible—(1929)

ঘরের ছেলে বাহিরে

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনের মাঝখানে একটা ব্যবধান আছে; দুটি মন দুটি আলোক-কেন্দ্রের মত এই ব্যবধানের দুই প্রান্ত উজ্জ্বল করে রেখেছে কিন্তু ব্যবধান-পারাপারের পথটি চির অন্ধকারে রয়ে গেছে। কলেজের পড়া ও শিক্ষকের উপদেশে আমার মনে জ্ঞানের পূর্ণতার বদলে অপরিসীম বিরক্তি ও শূন্যতা জমা হয়ে উঠছিল। পড়ার মধ্যে আমি কিছুই পাচ্ছিলুম না, মন আমার কোন্ সুদূরের জন্য থেকে থেকে কেবলই ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। অচিন শিব-সুন্দরের জন্য আমার চিত্ত পিপাসিত হয়ে আমার অতৃপ্ত আত্মাকে চির-চঞ্চল করে তুলছিল। পথের টান আমি অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। ঘরের মোহ, আত্মীয়ের স্নেহ, দেশের সঙ্গে সহজ যোগকে আমি কোনদিন অস্বীকার করিনি, কিন্তু এইসব যোগসূত্র কখনও আমার পক্ষে বন্ধন হয়েও ওঠেনি। তাই যখন যন্ত্রবিদ্যা শিখে কলকারখানা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্য জাপান যাবার সুযোগ পেলুম, সেদিন আদৌ ইতস্ততঃ করিনি। মনে আরও একটা সঙ্কল্প ছিল। এ জ্ঞান যে প্রয়োজন হলে দেশের কাজে লাগাতে পারবো, পাশ্চাত্য-দেশের মত স্বদেশকে সম্পদের স্বর্গে পরিণত করতে সাহায্য করবার অধিকারী হ'ব, এ চিন্তা ছিল আমার গৌরব।

যে-প্রতিষ্ঠান আমায় পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা কেবলমাত্র জাহাজ-ভাড়াই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার সব চেয়ে বড় পাথেয় ছিল মায়ের

আশীর্ব্বাদ। তিনি বলেছিলেন—তুমি বেরিয়ে পড়। বিশ্বের কাল-ধারাকে বোঝবার চেষ্টা করো এবং জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তার সামঞ্জস্য করে নিও। আমায় যিনি সীমাহীন পথে নামিয়ে দিয়েছেন, কালের পথ যেখানে শেষ হয়েছে, অগোচরে তিনি সেইখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছেন।

জাপানে এসে বয়ন-কারখানায় কাজ শিখতে গেলুম—রোজ সকাল সাতটায় কারখানায় ঢুকতে হ'ত আর কাজশেষের ঘণ্টা পড়তো সন্ধ্যা ছয়টায়। অবশ্য মাসে দুদিন পুরো ছুটি পেতুম।

সেবার যখন বসন্তে চেরীফুল ফুটল, সে-দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য আমরা তিনদিন ছুটি পেলুম। জাপানে এই সুন্দরের পূজা আমার কাছে খুব চমৎকার বলে মনে হয়েছিল। মনে হ'ল যে তারা ধর্ম্মনীতি, আধ্যাত্মিকতা কোন কিছুতেই তত বিশ্বাস করে না, যত করে এই সুন্দরকে। অথচ কামাকুরার শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন বুদ্ধমূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমার সারা দেহ-মন অপূর্ব্ব পবিত্রতায় ভরে গিয়েছিল।

এই তিন দিনের উৎসব শেষে কারখানায় ফিরে এসে একটি ঘটনায় আমার চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। আমি বসে বসে একটা যন্ত্রের নক্‌সা করছিলুম এবং একটি জাপানী মেয়ে সেই কলে কাজ করছিল। অন্যমনে হাত নাড়তে গিয়ে কলের চাকায় তার হাত আটকে গেল। হঠাৎ চেয়ে দেখি তার মুখ সাদা হয়ে গেছে; তার বেদনা-কাতর চীৎকারে সারা ঘর যেন কেঁপে উঠ্‌ল। প্রথমেই তার দিকে ছুটে যেতে ইচ্ছা হলেও কল থামাবার জন্য আমায় ইঞ্জিনিয়ারের কাছে দৌড়তে হ'ল। ফিরে এসে দেখি মেয়েটি মেঝেয় বসে তার আহত হাতখানি অপর হাতে ধরে আছে। হাতখানি তার একেবারে পিষে গেছে। অন্য সব লোকেরা এসে পড়ে তাকে তখনি নিয়ে গেল।

কী অদ্ভুত এই জাপানীরা—এত বড় বেদনায় চোখ থেকে তার দু'ফোঁটা জল পড়ল না! হাতখানি বুকের কাছে নিয়ে চোখ বুজে মেয়েটি বসে বসে দুল্‌ছিল, সে দৃশ্য আজও আমার মনে আছে। পরে শুনলুম, এই দুর্ঘটনার ক্ষতি-পূরণস্বরূপ কোম্পানী তাকে হাজারখানেক টাকা দিয়েছে। তার জায়গায় যখন নতুন লোক নেওয়া হ'ল, তখন কি জানি কেন মন আমার ব্যথায় ভরে গেল। যে গেছে তার সম্বন্ধে কোন কথাই আমরা আলোচনা করতুম না—প্রাণহীন যন্ত্রগুলোর মত আমরাও যেন মানুষের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে গেছি।

এই নির্ম্মমতা ও উদাসীনতার পথে কালধারাকে উপলব্ধি করার চেয়ে সুষ্ঠু কোন পথের সন্ধানে এ কাজ ছেড়ে দিলুম। এই সময় একজন দেশের লোকের দেখা পেলুম—তিনি মার্কিন মুলুক ঘুরে এসেছেন। তিনি বল্লেন—"জাপানে আবার মানুষ আছে? যন্ত্রপাতির সভ্য ব্যবহার যদি দেখতে চাও তবে যাও আমেরিকায়!" তারপর তিনি সে-দেশের এমন একটা বর্ণচিত্র আঁকলেন আরব্য-রজনীর রঙ্গিন গল্পেই যার জুড়ি মেলে এবং কথা শেষ করলেন এই বলে' যে আমেরিকায় যে যেতে চায় না এ পৃথিবী ছেড়ে যাওয়াই তার পক্ষে সুবুদ্ধির কার্য্য। তিনি আরও কত কি বলেছিলেন, কিন্তু অতি প্রাচীন সেক্‌স্‌পীয়ার মিল্‌টন প্রভৃতির ইংরেজীতে অভ্যস্ত থাকায় তাঁর সকল কথা বুঝতে পারি নি। তাঁর কথা ও বলবার ভঙ্গি দুই-ই আমায় মুগ্ধ করেছিল। মার্কিনে গিয়ে নানা অভাবনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের লোভে আমার মন উৎসুক হয়ে উঠ্‌ল।

জাপানে আমায় আরও মাস চারেক থাকতে হল—একে তো মনস্থির করতে পারছিলুম না, দ্বিতীয়ত সান্‌ফ্রান্সিসকো যাবার মত জাহাজ-ভাড়া ছাড়া আমার হাতে একটি পয়সাও ছিল না। দেশ ছেড়ে, জাত ছেড়ে অতীত জীবনের সমস্ত বন্ধন দূরে ফেলে রেখে জীবনের

এই অভূতপূর্ব্ব বিষম পরিবর্ত্তনের পথে শেষে একদিন চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লুম। জাপান বিদেশ হলেও, প্রাচ্য দেশের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ আছে, কিন্তু এবার যেখানে পাড়ি জমালুম সেখানে আমার দেশের ধারা বজায় রাখবার কোন উপায়ই রইল না—আমার দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে এ দেশের কোন মিল যে নেই তা বুঝেছিলুম, কিন্তু কত বড় পরিবর্ত্তন যে আমার জন্য সঞ্চিত ছিল তার কোন ধারণা আমার ছিল না।

২

আমেরিকায় পৌঁচেছি! যে মুহূর্ত্তে বন্দর-কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে এদেশে পা ফেলবার অনুমতি পেলুম তখনি জাপানী জাহাজে সতেরো দিন ডেকবাসের মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা যেন নিজের বলে' মনেই হ'ল না। কি জানি কেন এ দেশের উপর আমার মনে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জেগে উঠ্‌ল তাতে নতজানু হয়ে এ দেশের মাটিকে প্রণাম করবার ভারি ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু আমেরিকানরা এক অদ্ভুত জাত! যে মুহূর্ত্তে তাদের দেশের উপর আমার প্রকৃত মনোভাবের কথা জানলে অমনি আমার মন থেকে যেন-তেন-প্রকারে সে ভাবের মূলোৎপাটনে তারা প্রয়াসী হ'ল।

জাহাজ থেকে নামবার মুখে প্রথম যে লোকটির সঙ্গে দেখা হ'ল তার অদ্ভুত সাজ-সজ্জা দেখে ত আমি অবাক (পরে জানলুম সে overalls পরেছে)। সে আমার জিনিসপত্রের খবরদারী করতে এসেছিল, আমি তাকে আমার তোরঙ্গটা দেখিয়ে দিলুম। বিনাবাক্যব্যয়ে সে ডেক থেকে প্রায় আট-দশ ফুট নীচে জেটির উপর সেটি ছুড়ে দিলে। চল্‌তি ভাষায় দখল কিছু কম থাকায় আমার মনোভাবের আভাস দেবার জন্য

আমি কবি মিল্টনের জলদগম্ভীর পংক্তি উদ্ধৃত করলুম—"Him the Almighty Power hurled headlong flaming from the ethereal sky!" সে লোকটা একটু ব্যঙ্গের স্বরে বল্লে—আরে থাম, থাম, এ যে একেবারে নয়া আমদানি দেখছি! মার্কিনের দীক্ষা এমনি করেই সুরু হ'ল।

সে রাতটা একটা বোর্ডিং-হাউসে কাটিয়ে আমি ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার জন্য বার্ক্‌লে শহরে যাত্রা করলুম। কারণ, জ্ঞান আহরণই ছিল আমার আমেরিকা আসার প্রধান উদ্দেশ্য। একটি বন্ধু আমায় পনেরো ডলার ধার দিয়েছিলেন এবং তাই ছিল আমার একমাত্র সম্বল। জ্ঞানপিপাসু হয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছলুম, কিন্তু আমার জানা ছিল না যে, রুটির মত জ্ঞানেরও দাম দিতে হয়। চুম্বক যেমন ছুঁচ টানে তারা তেমনি ডাক্তারখানার খরচ, ব্যায়ামশালার চাঁদা ইত্যাদি নানারকম ছুতোয় যখন একে একে সব কটা ডলার নিয়ে আমার পকেট খালি করে দিলে আমি তখন ভারি ভয় পেলুম। বিদেশে নিঃসম্বল অবস্থায় চলবে কি করে? যাই হোক, এক সহযাত্রীর সহৃদয়তায় এই বিদেশে আমার বন্ধুর অভাব হ'ল না। জাহাজে বারুশ বলে একজন মার্কিন ইহুদীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে একদিন সেকেণ্ড ক্লাশ ডেক থেকে জাহাজের পিছন দিকে থার্ড ক্লাশে এসে আমার সঙ্গে কথা সুরু করলে। কথাপ্রসঙ্গে মার্কিন সাহিত্যিক ইমার্সনের একটা উক্তি উদ্ধৃত করায় সে চমৎকৃত হয়ে আমায় বল্লে—বাঃ, তুমি ত বেশ শিক্ষিত দেখছি! প্রথম যৌবনের আত্মপ্রত্যয়ে আমি উত্তর করলুম, হাঁ, শিক্ষিত বই কি! এই কথায় আমার উপর তার কেমন মমতা জন্মে গেল, উপরে তার ঘরে আমায় সে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে। বাইরে স্বীকার না করলেও তার সঙ্গে রোজ রোজ চা খাওয়া আমার কাছে একটা গর্ব্বের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া এ-সূত্রে আমি কিছু

খেতেও পেতুম। কারণ থার্ড ক্লাশে আমাদের জন্য যে জাপানী খাবারের বন্দোবস্ত ছিল তা আমার গলা দিয়ে নামত না।

বান্ধশ থাকত সিয়াটলে। আমি বার্ক্‌লে যাব শুনে তার আত্মীয়স্বজনের কাছে এক পরিচয়-পত্র দিয়ে দিলে। তাঁরা থাকতেন ওক্‌ল্যাণ্ড শহরে। তাঁরা খুব যত্ন করে আমায় সাতদিন রেখেছিলেন। আসবার সময় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি কয়েকটা দিশী কম্বল ও জাপানী ফুলদানী তাঁদের উপহার দিয়ে এলুম। এগুলি আমার তোরঙ্গতেই ছিল। অন্য উপহার কেনবার আমার পয়সা ছিল না এবং যদি সে কথা তাঁরা ঘুণাক্ষরেও জানতেন, তবে আমার কাছ থেকে এক কাণাকড়িও তাঁরা নিতেন না। তাঁদের মত সহৃদয় ও উদার লোক জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি।

কিন্তু এমনি করে দিশী শিল্পের বদলে বিদেশী খাবার সংগ্রহ আর কত দিন চলে! কাজেই তাড়াতাড়ি একজন ভারতীয় ছাত্রের কাছে কি ামর্শ চাইলাম। সে বল্লে—বেরিয়ে পড়, একটা কাজ খুঁজে নাও। উঠ্‌ন হ'ল সে ভদ্রলোক ওদেশে বহুদিন যাবৎ আছে। তাকে জিজ্ঞাসা ই-রলুম—কি কাজ নেবো? সে বল্লে—বাসন-মাজা, ঘর-পরিষ্কার করা, যা পাও তাই! যাও, প্রতি দরজায় ঘণ্টা বাজাও, কোথাও না কোথাও মিলে যাবে! আমি তার কথামত দরজায় দরজায় ঘণ্টা দুলিয়ে বেড়াতে লাগলাম। প্রতি দরজাই একটু ফাঁক হ'ল, আর শব্দ এল—'ধন্যবাদ, চাই না'—এবং সে স্বর-বৈচিত্র্য কোথাও শার্দ্দূল-গর্জ্জন, কোথাও বা সুন্দরীর হাসিমুখের মিষ্টি কথায় প্রকাশ পেল।

শেষে একটি বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করলে—কি কাজ জানো তুমি? মুখস্থ-মত আমি বল্লুম—সবই পারি—ঘর-পরিষ্কার, বাসন-ধোওয়া যা বলেন! বাড়ীর কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন—কাল থেকে কাজ আরম্ভ করবে ত! আমি সম্মতি জানালুম—কিন্তু আজ রাতটা কাটাই

কোথায়? খুব বিনীতভাবে বল্লুম—আজ থেকে কি আসবো? তিনি একটু গম্ভীরভাবে বল্লেন—বেশ, খিড়কির দিকে তোমার ঘর তৈরী থাকবে।

সেদিন বিকালে আমি সেই বাড়ীতে হাজির হলুম, সঙ্গে আমার বুঁচকি-বোঁচকা ও একখানি বই। বইখানি ইমার্সনের Self Reliance। খিড়কির দিকে একখানি ছোট ঘর দেখিয়ে দিয়ে তাঁরা আমায় কিছু খেতে দিলেন, আমি বর্ত্তে গেলুম, কারণ সারাদিন কিছু খেতে পাইনি।

পরদিন থেকে আমার কাজ আরম্ভ হ'ল। কোনরকমে বাড়ীর ঝাড়-পোঁছ করলুম! ধূলোময়লা জঞ্জালের টবে না ফেলে আমি বাড়ীর পাশের পথটাতে জমিয়ে রেখে দিলুম! পাশের বাড়ীর লোকেরা টেলিফোনে আমার কর্ত্রীকে জানালেন যে দেশের আইনমত পাশের পথ পরিষ্কার রাখা দরকার। নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমি তাড়াতাড়ি শুধু সার্টপরা অবস্থায় (হাতে আবার সাস্‌পেণ্ডার লাগানো ছিল) ঝাঁট দিতে যাচ্ছি দেখে কর্ত্রী বল্লেন—অমন করে বাইরে গিয়ে আর আমাদের অপ্রস্তুত কোরো না, জ্যাকেট পরে নাও! কোটকে যে এরা জ্যাকেট বলেন তা জানতুম না, তাই তাঁরা যতক্ষণে আমায় ব্যাপারটা সব বোঝাতে লাগলেন, ততক্ষণে হাওয়ায় বেশীর ভাগ ময়লা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

যাই হোক, এ কাজ আমার বেশীক্ষণ টিকলো না। দুপুরের মধ্যে বিস্তর ময়লা বাসন জমা হয়ে গেল। কর্ত্রী বল্লেন—খেয়ে উঠে বাসন ধুয়ে দেবে ত? আমি সম্মতি জানিয়ে তাড়াতাড়ি খেতে বসলুম। বাসনের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। বাইরে চমৎকার রোদ উঠেছিল, বেড়াবার লোভ সামলাতে না পেরে কোটটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। যখন ফিরলুম তখন কর্ত্রী খুব রেগে বল্লেন—বাসনগুলো ধোওনি যে?

আমি বল্লুম—আপনারা কেমন করে মাজেন?

তিনি অবাক হয়ে বল্লেন—তুমি তা জান না নাকি ?

আমি বল্লুম—না।

তিনি বল্লেন—বাঃ, তুমি বাসন মাজবে বলেই ত কাজ নিয়েছ।

আমি বল্লুম—মাজবো না কেন ? দেখিয়ে দিলেই মেজে দেবো।

খুব বিরক্ত হয়ে তিনি বল্লেন—তুমি বাপু অন্য জায়গা দেখ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কোন্ জায়গা ?

তিনি বল্লেন—আরে তোমার হয়ে গেল।

আবার আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়ে গেল ?

তিনি বুঝিয়ে বল্লেন যে, আমায় নিয়ে তাঁদের কাজ চলবে না! শেষে একটু হেসে বল্লেন—তা আজ রাতটা এখানে থাকতে পারো।

রান্নাঘরে বসে বসে তাঁর বাসন-ধোওয়া দেখতে লাগলুম—কেমন করে এসব বাসন মাজতে হয়, মুছতে হয়, সব বসে বসে বিশেষ করে লক্ষ্য করতে লাগলুম, যাতে অপর বাড়ীতে এ-জ্ঞান কাজে লাগাতে পারি।

কাজে জবাব পেয়ে আমার খুব বিরক্ত লাগলো। মনে করলুম এ রকম খামকা অপমানিত হয়ে আর এদের আতিথ্য নেব না। তাই বুঁচকি-বোঁচকা নিয়ে আবার কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। আবার বাড়ীতে বাড়ীতে দরজায় ঘণ্টা বাজানো সুরু হ'ল—খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে নানারকমের তর্জ্জন-গর্জ্জন কানে আসতে লাগল। একটা বাড়ীতে ঘণ্টা বাজাবার পর চাকরটি এসে দরজা খুলে দিলে ; আমি আশান্বিত হয়ে আমার প্রয়োজন জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিলে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি ভাবলুম, ইংরেজী উপন্যাসে যে লেখে "নাকের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া" এ সেই ব্যবস্থা। আমার আজও মনে আছে যে দরজাটা একেবারে আমার নাকের ডগায় ঠেকেছিল।

যাই হোক, কিছু পরেই আর এক জায়গায় কাজ মিল্‌ল। এবারের কাজ হ'ল বাসন ধোওয়া, কাঁটা-ছুরি পরিষ্কার করা ও খাবার সময় টেবিলে পরিবেশন করা। এর বদলে তারা আমায় থাকতে ও খেতে দিলে। এই সময় কলেজ খুলে গেল, পড়াও আরম্ভ হ'ল, সুতরাং কাজের ফাঁকে ক্লাসে যাওয়া ও পড়াশুনা চলতে লাগল।

এই নতুন বাড়ীতে সকালের বাসনগুলো খুব ভালো করেই ধুয়েছিলুম, সকালে পরিবেশনও করতে হ'ল না। এটা ছিল ছেলেদের ক্লাব। তারা লোক ভালই, তবে সারাদিন হল্লা করত বিস্তর। কলেজে যাবার জন্য প্রস্তুত হবার আগে মানুষ যে এত গোলমাল করতে পারে কোন কালেই আমার সে ধারণা ছিল না। কী সে হট্টগোল!

সেদিন দুপুরের খাবার সময় টেবিলে পরিবেশনে আমার দীক্ষা হ'ল। প্রথমবার বলে আমি ভারি ভয় পেয়েছিলুম। একটি ছেলে এক প্লেট স্যুপ চাইলে। তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসে স্যুপের থালাটা যেমনি ছেলেটির সামনে রাখতে যাবো অমনি তার মাথায় লেগে সমস্ত স্যুপটা তার পিঠের ভিতর গড়িয়ে পড়লো। যাকে বলে মার্কিন ভাষা এই ব্যাপারে তার যথেষ্ট পরিচয় পেলুম। ক্লাবের চীনা পাচকটি যখন বুঝলে যে পরিবেশনের অ-আ, ক-খ'র জ্ঞান আমার নেই, বিনা বাক্যব্যয়ে সে তখন পরিবেশনের পোশাক—সাদা কোটটি পরে কাজে লাগলো। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি তার কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করতে লাগলুম এবং প্লেটের পর প্লেট স্যুপ সে ছেলেদের সামনে বসিয়ে দিচ্ছে, অথচ তার হাত একটুও কাঁপছে না দেখে আমার ভারি আশ্চর্য্য মনে হ'ল। পাচক ভদ্রলোকটি আমার উপর ভারি সদয় ছিল; তার কাছে পরিবেশন ও বাসন মাজার অনেক কায়দা-কানুন শেখবার সুযোগ পেলুম।

কিন্তু আমার এ কাজটিও গেল—এবারের কারণটি আমার

অনভিজ্ঞতা নয়, একেবারে বিভিন্ন রকমের। আমি দেখলুম যে চীনে-ম্যান আমার ঘাড়ে রোজ রোজ নতুন নতুন কাজ চাপাতে লাগলো। পরিবেশন ও বাসন মাজা ছাড়া জিনিসপত্র ঘসা-মাজার কাজও আমায় করতে হ'ল। কাজ বাড়ছে দেখে আমার মনে হ'ল যে কোন্‌দিন বা আমায় আবার রাঁধতে বলে, তাই বিরক্ত হয়ে নিজেই কাজ ছেড়ে দিলুম। কেমন করে যে লোককে অন্যায়ভাবে খাটিয়ে নেওয়া যায় এই ব্যাপারে তার আভাস পেলুম।

আবার কাজ খুঁজতে বেরলুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে শেষে একটা চমৎকার কাজ পেলুম। কাজ হ'ল বাসন ধোওয়া, পরিবেশন ও বিছানা করা, আর তার বদলে পাবো খাওয়া-থাকা বাদে মাসে দশ ডলার। প্রথম দুদিন আমায় বিছানা করতে হ'ল না। কারণ আমার আগে যে ছেলেটি কাজ করছিল, সে ঐ দুদিন থেকে সব ঘরের কাজ করে গেল—আমি আর সে-সব ঘরের ধারেও গেলুম না।

তৃতীয় দিনে সে চলে গেল। ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে সকাল বেলার বাসন ধুয়ে আমিও কলেজে গেলুম। দুপুরে এসে পরিবেশন করে আর ডিস ধুয়ে আবার কলেজে বেরিয়ে পড়লুম। বিকালে ফিরে এসে বিছানা করতে গিয়ে দেখি একটা চীনা ছোকরা কাজ করছে। আমি বল্লুম—তুমি এখানে করছ কি? সে বল্লে—বিছানা করছি। আমি বল্লুম—তুমি করছ কেন—ও ত আমার কাজ! সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে আমায় জানিয়ে দিলে যে এ-বাড়ী থেকে আমার অন্ন উঠেছে।

পরে জানলুম যে বিছানাগুলো আমার সকালেই করা উচিত ছিল, বিকালের জন্য ফেলে রাখা ঠিক হয়নি—তাই এসে দেখি আমার জায়গায় চীনা ছোকরার অধিষ্টান হয়েছে। যাই হোক দাঁড়িয়ে থেকে তার বিছানা করা শিখে তবে সে বাড়ী ছাড়লুম।

দু'দিন কাজ করেছি বলে বোধ হয় কয়েক সেণ্ট মজুরী পেয়েছিলুম। পকেটে সেই সম্বল আর বগলে পুঁটুলি নিয়ে সারাটা দিন কাজ খুঁজে কাটিয়ে দিলুম। রাত হ'ল—কোথাও আশ্রয় পেলুম না। মাথা গোঁজবার স্থান না পেয়ে জীবনে এই প্রথম সারারাত আমায় রাস্তায় রাস্তায় পায়চারি করে কাটাতে হ'ল।

সকালে আর আমার ধৈর্য্য রইল না—হাতে যা পয়সা ছিল তাই দিয়ে বেশ পেট ভরে খেলুম। মনে করলুম বাকি পয়সায় যতক্ষণ চলে চলুক, মরে যাই তাও স্বীকার তবু কারো দোরে যাবো না। পথ চলছি এমন সময় এক বোর্ডিং-হাউসের বাড়ীওয়ালী আমায় ডেকে বল্লে—তুমি ডিস ধুতে পারো? খুব জোরের সঙ্গে বল্লুম—হ্যাঁ, পারি বৈকি! সে বল্লে—পরিবেশন করতে জানো? আমি বল্লুম—জানি। বিছানা করতে পারো? আমি বল্লুম—হ্যাঁ, সে বিদ্যাও আমার জানা আছে।

বাড়ীওয়ালী বল্‌লে—বেশ, তাহলে আজ দুপুর থেকে কাজে লাগো —আমার লোকটি চলে গেছে। এ বাড়ীতে সব কাজই আমি বেশ গুছিয়ে করতে লাগলুম, কাজেই ভয়ের কিছুই রইল না।

৩

এদিকে কিন্তু কলেজের পড়াশুনায় আমি ভারি হতাশ হয়ে গেলুম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন প্রবেশিকা পড়ি তখন থেকেই শিক্ষকদের সততা সম্বন্ধে ভারি একটা সন্দেহ ছিল। আমরা সব সময়ে ভাবতুম যে সরকারের বেতনভোগী বলে তাঁরা সত্য কথার বদলে সরকারের মনযোগানো কথা বলতেন। আমার বিশ্বাস সে সময়ে ফরাসী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কয়েকখানা বই পড়ানো সরকার থেকে বন্ধ করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে Burke লিখিত Reflections on the French

Revolution পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল কিন্তু ও-ধরণের শান্ত-শিষ্ট বই পড়ে কেউ সন্তুষ্ট হতে পারত না। মানুষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে আমরা তখন বন্ধুমহলে ভয়ানক আলোচনা সুরু করেছিলুম। আমরা অনেকেই বুঝেছিলুম যে এসব সম্বন্ধে অনেক সত্য কথাই আমাদের শেখানো হয় না, কারণ তা নাকি ভয়ানক বিদ্রোহদ্যোতক। সুতরাং ফরাসী বিদ্রোহ বা ইংলণ্ডে ক্রমওয়েল-যুগের অন্তর্বিদ্রোহের ইতিহাসের কোনো ভয়ানক জায়গা এলেই আমরা নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া সে সম্বন্ধে যত বই পেতুম তা পড়ে নিতুম। শিক্ষকের কথার প্রতিবাদ করে সত্যটুকু জানাই ছিল আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানবৃদ্ধির এ-রকম কোন সদাজাগ্রত চেষ্টার লক্ষণ দেখলুম না। কলেজের ছেলেরা কেবলই দেখছি নোট টুক্‌ছে; অধ্যাপকের উক্তি তাদের কাছে বেদের মতই যেন অভ্রান্ত। অধীত বিষয় জানবার জন্য না ছিল কোন প্রশ্ন, না ছিল কোনো আলোচনা! পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে অধ্যাপকের জ্ঞান প্রয়োজনের চেয়ে কম জেনেও যখন ছেলেদের প্রতিবাদ করবার কথা মনে হ'ত না তখন আমার ভারি অদ্ভুত লাগত। অবশ্য ভারতে প্রতিবাদ করে ফল কিছুই হ'ত না কিন্তু এ সময়ে মার্কিন ছাত্র-সমাজ যেন এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিল। তারা কলেজে এসেছে পরীক্ষা পাস করতে আর অর্থকরী বিদ্যা শিখতে এবং সেটুকু ভাল করে হলেই তারা খুশী হ'ত। অধ্যাপকের কথা সত্য কি মিথ্যা তাতে তাদের কি আসে যায়!

একদিন টেবিলে পরিবেশন করবার সময় একটি ছেলে আমার দিকে চেয়ে বল্ল—তোমায় ক্লাশে রোজ দেখি না? আমার ঘরে এসো না, বেশ কথা হবে! তার সঙ্গে আমার দেশ-প্রচলিত প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধের কথাটাই প্রথম মনে এল। আমি তাকে সেলাম করে পূর্ব্বের মত পরিবেশনে মন দিলুম এবং এমনভাবে ব্যবহার করতে লাগলুম

যেন তার কথার একবর্ণও আমি বুঝিনি। তাই যখন খাওয়া শেষ হ'ল সে ছেলেটি রান্নাঘরে এসে আমায় খেতে দেখে বল্লে—বুঝলে, খাওয়া সেরে আমার ঘরে একবার আসছ ত?

আমি বল্লুম—কোন্ ঘরে?

সে বল্লে—আমার ঘর ত তুমি জানো।

আমি বল্লুম—বেশ যাবো।

সন্ধ্যাবেলা সেদিন যখন তার ঘরে হাজির হলুম সে খুব খুশী হয়ে বন্ধুর মত যত্নে আমায় বসালে।

কথাপ্রসঙ্গে সে আমায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—তুমি এনার্কিজম সম্বন্ধে কিছু জানো?

আমি বল্লুম—জানি এবং ক্রপটকিনের কমিউনিজমে বিশ্বাস করি।

সে তাচ্ছিল্যভরে বল্লে—আরে ছোঃ, সে আদৌ এনার্কিজম নয়—সেটা ছ্যাঁচড়া।

সে আবার কি?

যা রোজ খাও—রাবিশ আর কি!

তার কথা শুনে আমি ত হতভম্ব! ক্রপটকিনের Conquest of Bread গ্রন্থে ত এ ছ্যাঁচড়ার কোন উল্লেখ দেখি নি। লিও (Leo) (ছেলেটির নাম) আবার ভাল ছ্যাঁচড়া ও মন্দ ছ্যাঁচড়ার তফাৎ বোঝাতে লাগলো। ক্রপটকিনই বা কি দিয়েছেন, টলষ্টয়ই বা কি রচেছেন, সব কথা বলে Proudhon প্রচারিত এনার্কিজম-এর স্বপক্ষে একটা সতেজ বক্তৃতা দিয়ে সে থামল। তার বিশ্বাস যে কমিউনিজম-রূপ রাবিশ সাফ করবার এই একমাত্র সম্মার্জ্জনী। অবশ্য তাঁদের সবায়ের রচনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও উপরিউক্ত ভদ্রলোকদের নামগুলি আমার শোনা ছিল।

লিও আমায় তার ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলি লক্ষ্য করতে বল্লে। ঘরে প্রথম ছবি ছিল Adam Smith, দ্বিতীয় Tolstoi, তৃতীয় Bakunin, চতুর্থ Kropotkin, পঞ্চম Karl Marks, ষষ্ঠ Victor Hugo এবং সপ্তম ও শেষ ছবি ছিল Jesus Christ-এর। একে একে সবায়ের কথা কিছু কিছু বলে যীশুর ছবি দেখিয়ে সে বল্লে—এ লোকটির সঙ্গে কোন চার্চ্চের সংস্রব ছিল না এ কথা তোমার ভাল করেই জানা উচিত।

আমি বল্লুম—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

আমার কথা শুনে সে খুব উত্তেজিত হয়ে বল্লে—তোমারও মনে হয়—আরে তুমি যদি তাঁকে হাতে ধরে চার্চ্চের সাম্‌নে নিয়ে গিয়ে বলতে, প্রভু, এটা আপনার বাড়ী, তা হলেও তিনি তা স্বীকার করতেন না—নিজের বলে' চিনতেন না।

আমি বল্লুম—আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না যে ইনি প্রথম শ্রেণীর লোক?

সে বিশ্বাসী ভক্তের মত মৃদু হেসে বল্লে—যিনি শেষ তিনিই প্রথম!

আমি তাকে তার নিজের জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করলুম। বর্ত্তমান সমাজের ভিত্তি যা সাড়া দেয় এমন সব সমস্যা, এত সব কথা, সে কেমন করে জানলে?

সে বলতে লাগল—'আমি এক আইরিশ পরিবারে জন্মেছি। আমার বাবা মা আয়ারল্যাণ্ডে এক রেল দুর্ঘটনায় মারা পরেন। আমার এক অবিবাহিতা পিসী আমাদের তিন ভাইকে নিয়ে এখানে এক কাকার বাড়ীতে উঠলেন। ক্যালিফোরনিয়ায় ওকালতি করে তিনি বিস্তর পয়সা করেছেন। তিনিই আমাদের মানুষ করলেন। আমার দাদা ব্যবসা শিখতে গেলেন, আমি ক্যাথলিক পাদ্রী হব বলে' প্রস্তুত হতে লাগলুম এবং আমার ছোট ভাইটি আইন পড়তে গেল।

বড় হয়ে পাদ্রী হব বলে' ছেলেবেলা থেকেই আমি জেস্যুইটদের স্কুলে ভর্ত্তি হলুম। সেখানে ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ ও কিছু কিছু গ্রীক শিখলুম। সেখানে প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজকদের জীবনী ও খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস আমাদের পড়তে হ'ত। ক্রমে ক্রমে দেখি তারা আমার মনের সামনে এক বিরাট্ প্রতিষ্ঠান খাড়া করে তুল্লে—একদিকে তার ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া-কলাপ আর অপরদিকে কূট-চিন্তার পদ্ধতি। এ দুটি জিনিস পোপের অভ্রান্ততা—এই মতবাদ দিয়ে এক সঙ্গে গাঁথা। এইখানে জেস্যুইট পাদ্রীরা যখন আমায় পড়াতেন তখন আমার মনে হ'ত যে লোক যদি সত্যই ধার্ম্মিক হয় তবে এঁদের মত দারিদ্র্য বরণ করেও উপলব্ধ সত্য প্রচারে জীবন উৎসর্গ করা উচিত।

নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ও অধ্যাপকের মতের অনুকূল কয়েকটি বই ছাড়া বাইরের বই আমাদের পড়তে দেওয়া হ'ত না। কিন্তু একজন অধ্যাপক আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে তাঁর লাইব্রেরী দেখাতে দেখাতে প্রসঙ্গক্রমে কতকগুলি বই দেখিয়ে বল্লেন যে সেগুলি অজ্ঞেয়বাদীদের রচনাবলী। বিশেষ করে একখানি বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে—সেখানি Buckle প্রণীত Introduction to the History of Civilisation in England। কোন কাজে যখন অধ্যাপক ঘর ছেড়ে চলে গেলেন আমি সেখানে বসে বইখানির পাতা উল্টাতে লাগলুম। কয়েক পাতা পড়তেই এমন আগ্রহ জন্মে গেল যে ছাড়তে পারলুম না, বইখানি নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সারারাত ধরে পড়লুম।

পরের দিন রাতে আবার বাক্ল্ নিয়ে বসলুম। এক জায়গায় এই কয়টি পংক্তি দেখতে পেলুম—'যদি পৃথিবীর তাপ বদলায় ও বাতাসে সামান্য পরিমাণে অক্সিজেন কমে যায়, তবে পৃথিবী এমন সব প্রাণীর আবাসভূমি হবে যার সঙ্গে মানুষের কোন মিল নেই এবং সর্ব্ববিষয়ে তাদের ধারণা মানুষের থেকে একেবারে বিভিন্ন হয়ে যাবে।' বই বন্ধ

করে আমি ভাবতে লাগলুম। এতদিন আমায় বিশ্বাস করতে হয়েছে যে ঈশ্বরের মত সত্য, অসীম ও সম্পূর্ণ—ভাল বা মন্দ কোন কিছুই আপেক্ষিক নয়। কিন্তু ধর যদি বাকুল্-এর কথাই সত্য হয় তাহলে এই পরিবর্ত্তিত বিশ্বে যারা থাকবে তারা বর্ত্তমানের লোকেদের থেকে একেবারে ভিন্ন হয়ে যাবে! ভাল, মন্দ, ভগবান এই সবের এত দিনের ধারণা একেবারে লোপ পেয়ে যাবে! পোপের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে ধারণাও তাহলে বদলাবে। মনে আমার কেবলই এই কথা জাগল যে তাহলে কোন কিছুই সম্পূর্ণ নয়! সবই আপেক্ষিক!

ঘরে বইখানা ফেলে রেখে আমি বেরিয়ে পড়লুম। আমার দৃঢ় ধারণা হ'ল যে সব জিনিসই যখন আপেক্ষিক তখন ভগবানকে সম্পূর্ণ বলে' কেমন করে স্বীকার করব? ভাবতে ভাবতে বাগানের বেড়া ডিঙ্গিয়ে আমি রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলুম।

খুব বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তারপর তুমি কি করলে? তারাই বা কি করলে?

লিও বল্লে—তারা আমার আত্মীয়দের খবর দিলে! এতদিন ধরে তারা আমায় যে সোশিয়ালিস্টদের ঘৃণা করতে শিখিয়েছিল আমি সোজা তাদের আস্তানায় গিয়ে উঠলুম! আমি যে কোথা থেকে আসছি সে কথা আর তাদের কাছে ভাঙ্লুম না। তারা আমায় ডারউইন আর স্পেন্সারের বই পড়তে দিলে। ডারউইনের মতবাদে আমার মাথা একেবার ভরে গেল—আমি তাঁর ভারি পক্ষপাতী হয়ে উঠলুম। তাঁর বইয়ের পাতার পর পাতা শেষ হতে লাগল এবং আমার এতদিনের নানা বিশ্বাস ও অবিশ্বাস একেবারে শুধু যে চূর্ণ হয়ে গেল তা নয়, মনে হ'ল যেন সেসব ধারণা আমার কোনদিনই ছিল না। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, সেদিন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, যে-মতবাদের জোরে আমার সব নষ্ট হ'ল তারও কোন ভিত্তি নেই।

ক্রমে আমি সোশিয়ালিষ্টদের দলে ঢুকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে কাঠের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে স্বরু করলুম। কিন্তু যতই তাদের সঙ্গে মেলামেশা হতে লাগলো ততই বুঝলুম বেশীর ভাগ লোকের মনেই উৎকর্ষের কোনো ছাপ নাই। আমি যে জেস্যুইট পাদ্রীদের কাছে শিখেছিলুম – তাদের মত জ্ঞানের সম্পূর্ণতার বা ধারাবাহিকতারও এদের খুবই অভাব ছিল। আমার আর তাদের ভাল লাগল না। কারণ আমার এতদিনের শেখা চর্চ্চা-পদ্ধতির বদলে তারা এক সমাজ-পদ্ধতির নক্সা আঁকলে যা অতি জঘন্য বলে মনে হ'ল। যেসব পবিত্রতা ও ধর্ম্ম-বিচারের মধ্যে আমি মানুষ হয়েছিলুম এ প্রণালীর মধ্যে তার নামগন্ধও ছিল না। তাই সমস্ত সোশিয়ালিষ্ট-পদ্ধতি ছুঁড়ে ফেলে আমি স্বাতন্ত্র্যমূলক এনার্কিজম বা নৈরাজ্যবাদ বরণ করে নিলুম।

এই সময় আমি টলষ্টয়, ক্রুপটকিন ও অন্যান্য বহুলোকের বই পড়লুম। আমার মানসিক প্রকৃতির সঙ্গে তাদের বেশ মিল হ'ল। পদ্ধতিহীনতার বদলে এঁদের কাছে এবার পেলুম পদ্ধতি, প্রভুত্বের বদলে এঁরা দিলেন স্বাধীনতা এবং সামাজিক যূথ-বদ্ধতার বদলে এঁরা শেখালেন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্র।

এদিকে কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজন আমার খোঁজ পেলেন এবং কোথায় আছি আর কি করছি জেনে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কারণ তাঁরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত মূলধনী মহাজন শ্রেণীর লোক। তাঁরা আমায় এই ব্যর্থ ভবঘুরে জীবনের মোহ কাটিয়ে শান্ত ছেলের মত কলেজে ফিরে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। যদি কলেজে গিয়ে আইন পড়ি তাহলে একটা মাসিক বৃত্তি দিতেও স্বীকৃত হলেন। তাই আজ আমি এখানে এসেছি এবং যে-অন্ধকারে পণ্ডিতেরা অন্ধভাবে ঘুরছেন, তার মধ্যে থেকে আলোক আহরণের চেষ্টা করছি।

তার কথাগুলো আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করলে।

অন্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে যেখানে বিচরণ করছি সেখানকার অন্ধকার যেন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। সে আমাকে দেশের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলে, আমার মনের দ্বন্দ্বের খবর নিলে, কিন্তু বেশ বুঝলুম এতে তার কোন্‌ আগ্রহ ছিল না। সে যা বাস্তবিক জানতে চাইছিল তা হচ্ছে যে, আমি স্বাতন্ত্র্যবাদী এনার্কিষ্ট হবো কিনা। এই চেষ্টার মধ্যে তার জেস্যুইট শিক্ষার প্রভাব প্রকাশ পেল। সে যেন সর্ব্বক্ষণ লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে যাকে তার দলে টানতে পারে।

৪

আর এক সপ্তাহের মধ্যে লিওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব জমে উঠ্‌ল। সে বোর্ডিং-হাউস ছেড়ে দেবে ঠিক করে তার বৃত্তির টাকায় একটা ছোট ঘর নিয়ে আমায় তার সঙ্গে থাকবার কথা তুললে। ঠিক হ'ল যে দিনে তিনবারের বদলে আমরা দু'বার খাবো এবং কোন সস্তা হোটেলে একটা ছোট ঘরে দু'জনে থাকব। আমার দিক থেকে আপত্তি করবার কিছুই ছিল না, কাজেই এ প্রস্তাবে খুব খুশী হলুম। শুধু যে বাসন-মাজার নোংরামি আর দাস্যবৃত্তির হীনতা থেকে মুক্তি পাবো তা নয়, এমন লোকের সঙ্গও পাবো যার কথা ও কল্পনা আমায় মুগ্ধ করেছে।

এমনি করে আমাদের নতুন ঘরকরনা স্বরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব বেশী পড়াশুনাও আরম্ভ হ'ল। দিনে আমরা প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টার উপর পড়তুম। প্রসিদ্ধ হলেও এতদিন যেসব লেখকের রচনা আমরা পড়িনি, সেই সব নিয়ে বসলুম। ওয়াল্ট হুইটম্যানের অন্তরের কথা কিছু বুঝলুম, বার্নার্ড শ'র সঙ্গে একটা চলতি আলাপ জমিয়ে নিলুম, প্লেটোর দরজায় ঘা দিলুম, কিন্তু তাকে পুরানো দলের বলেই মনে হ'ল। তারপর আমরা পড়লুম Proudhon-এর—'সম্পত্তি কি?'—What is

Property? সম্পত্তি যে ডাকাতি (লুটের মাল) তাঁর কাছে এ উত্তর পেয়ে খুব খুশীও হলুম। Thoreauকেও আমরা আবিষ্কার করেছিলুম! তারপর শেষকালে এল নিটশের বজ্রবিদারণ মন্ত্র—"বহুদিন পূর্ব্বে ভগবান গতাসু হয়েছেন—তাঁর Thus Spake Zarathustra পুস্তকে নায়কের মুখে এই উক্তি শুনে আমাদের বিশ্বাস হ'ল যে এইবার আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে।

কিন্তু অদৃষ্টের ক্রুর পরিহাসের মত কলেজের পরীক্ষা অলক্ষিতে ঘনিয়ে এল। লিও একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, আমি কোনরকমে এ যাত্রা বেঁচে গেলুম। পর বছর আমি একা পড়লুম, কারণ লিওর আত্মীয়েরা এই অনর্থকরী বিদ্যাসঞ্চয়ে বাজে খরচ করবার জন্য তাকে বৃত্তি দিতে রাজী হলেন না। এতে লিও খুব রেগে গেল ও আমায় বল্লে—"দেখলে ত, পড়াশুনা সম্বন্ধে মহাজনী ধারণাটা কি রকম? পরীক্ষায় যদি পাস হও তবে তোমায় তারা বুদ্ধিমান বল্‌তে রাজী আছে, ভাগ্যে আমি পাস হইনি!" তারপর তার বইয়ের বাণ্ডিল পিঠে ফেলে সে চলে গেল।

আবার কাজের জন্য বিরক্তিকর হয়রানি আরম্ভ হ'ল। দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে হাতে ব্যথা হ'ল, কিন্তু কাজ কোথাও পেলুম না। মাঝে মাঝে হঠাৎ লিও কোথা থেকে এসে হাজির হ'ত, কারণ, সে জানত যে ঘরের ভাড়া শেষ না হওয়ায় আমি তখনও সেই ঘরে আছি। সে প্রায়ই এসে দেখত যে বিছানায় বসে আমি অন্তত একটি প্রধান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি এবং সমস্যা হচ্ছে 'ক্ষুধা'। যখনই সে আসত, দয়া করে হয় রুটি না-হয় কিছু অর্থ আমায় দান করে যেত। বাধ্য হয়ে আমায় রুটি আর জল খেয়ে দিন কাটাতে হ'ত। আমার বেশ মনে আছে যে আমার অনিচ্ছা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমার কলেজের মাহিনার জন্য লিও আমায় পনেরো ডলার গছিয়ে দিয়েছিল। "এ তোমায় নিতেই

হবে। কে জানে—তুমি হয়ত একদিন জানতে পারবে মহাজনদের অস্তিত্বের ভিত্তিটা কোন্‌খানে, আর একবার সেই গোপন কথাটা জানতে পারলে তাদের অস্ত্রেই তাদের নিধন করবে!"

কী আশ্চর্য্য, দিনে দুখানা সস্তা রুটি আর জল খেয়ে আমরা মহাজনীতত্ত্ব আলোচনা করতুম আর ভাবতুম যে বছর পাঁচেকের মধ্যেই সে ব্যবস্থার পতন অনিবার্য্য। আমার বয়স তখন প্রায় উনিশ।

অবশেষে মেয়েদের ক্লাবে একটা কাজ পেলুম। সেখানে বাসন-মাজা, ঘর ও খেলার মাঠ সাফ করা আর পরিবেশনের বদলে তারা খাওয়া বাদে মাসে দশ ডলার দিতে রাজী হ'ল। তারা মাহিনা দিত সপ্তাহ হিসাবে। প্রতি শনিবার বিকালে সপ্তাহ শেষে যেদিন এই আড়াই ডলার হাতে পেতুম সেদিন মনে হ'ত যেন রাজ-ঐশ্বর্য্য লাভ করেছি।

মনে আছে প্রতি রবিবার বিকালে গাড়ী করে লিওর সঙ্গে দেখা করতে যেতুম। প্রায়ই দেখতুম রাস্তার মোড়ে একটা উল্টানো টবের উপর দাঁড়িয়ে সে বক্তৃতা দিচ্ছে। তার কথা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতুম। সে বক্তৃতা শেষ করে লোকেদের বলত—আমার এই হিন্দু বন্ধু আপনাদের কাছে টুপি নিয়ে যাচ্ছেন! এদেশে পেলা আদায়ের এই হচ্ছে ভদ্র পন্থা। টুপিতে কখনও পঞ্চাশ সেণ্টের বেশী আদায় হ'ত না। তাই আমার মাহিনা থেকে বাকিটা দিয়ে লিওকে আমি এক ডলার দিতুম। বক্তৃতা শেষে লিও আমায় রেস্তরাঁয় টেনে নিয়ে যেত। সে খেত খুব কমই কিন্তু প্রায় মাঝরাত পর্য্যন্ত আমাদের আলোচনার জের চল্‌ত। রাত্রে বিদায় নেবার সময় যখন তাকে আমার সঙ্গে ঘরে আসবার জন্য অনুরোধ করতুম সে আপত্তি জানিয়ে বলত—"না, রাতের পর রাত যতই আমি পথে পথে ঘুরি ততই এই মহাজনী ব্যবস্থার ভীষণতা যেন বেশী করে উপলব্ধি করি।"

জীবনে এবার প্রথম বুঝলুম যে এক স্যুট পোশাকে সারা বছর কাটানো চলে কিন্তু এক জোড়া জুতো ততটা কাজের নয়। ক্যালিফোর-নিয়ায় বর্ষা নামাবার অগেই আমার জুতো জোড়াটি শতছিদ্র ঝাঁজরির মত হয়েছিল। ক্লাবের রাঁধুনী ছিল একটি বর্ষিয়সী নিগ্রো স্ত্রীলোক। একদিন রান্নাঘরে যাবার সময় আমার জুতোর মধ্যে দিয়ে নানা পথে জল ঝরছে দেখে সে বল্লে—ব্যাপার কি? তোমার ভাল জুতো নেই নাকি?

আমি বল্লুম—না, শুধু এই জোড়াই আছে।

নতুন এক জোড়া কিনলেই পারো!

কিনব কি করে, পয়সা কোথায়?

সে তখন বল্লে—তাহলে বলতে চাও যে তোমার মত অভাগার এক জোড়া জুতো কেনবার পয়সা নেই।

আমি বল্লুম—অভাগা না হতেও পারি, তবে পয়সা নেই এটা সত্যি। কথাটা তার প্রাণে লাগল। সে বল্লে—দেখদেখি আমার ছেলে লক্ষ্মীছাড়া ক্লারেন্স বাবুয়ানা করে আমার পয়সা ওড়ায় আর তুমি একজোড়া জুতো পরতে পাও না!

আমি গম্ভীরভাবে বল্লুম—মিসেস রোডস্, এ দোষ শুধু মহাজনী ব্যবস্থার, আর কারো নয়!

সে তখনি আমার হাতে পাঁচ ডলার দিয়ে বল্লে—যাও, আগে নতুন জুতো কিনে এনে তবে কাজ করো।

আমি আপত্তি জানালুম—তোমার টাকা আমি নিতে পারবো না।

খুব হেসে সে বল্লে—এ শুধু তোমার ব্যবস্থার দোষ! তারপর আমায় জোর করে ঘরের বাহিরে সরিয়ে দিয়ে শাসালে যে যদি নতুন জুতো পরে না আসি তবে তার রান্নাঘরে আমায় কাজ করতে দেবে

না। কাজেই তখনি একজোড়া নতুন জুতো কিনে আনলুম। পরে যখন হাতে টাকা পেয়ে তার ধার শোধ করতে গেলুম নিগ্রো মেয়েটি তা নিতে অস্বীকার করলে।

মেয়েদের ক্লাবে নিত্য কাজের একঘেয়ে রুটিনে যখন মনটা বিরক্ত হয়ে উঠছে এমন সময় একদিন ক্লারেন্সের বাপ সশরীরে এসে হাজির হলেন। জানালার বাহিরে একটি কাফ্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি মিসেস রোড্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করলুম—ও লোকটি কে?

সে বল্লে—আরে ওই ত ক্লারেন্সের বাবা। ওকে আমি বহুদিন আগে ডাইভোর্স করেছি। এখন আবার টাকার দরকার, তাই আমার কাছে এসে জুটেছে।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি ওকে কত করে দাও?

তা কি আর মনে আছে! তারপর হঠাৎ আমার কাছে সরে এসে হাসতে হাসতে বল্লে—আমার কথা বিশ্বাস কর, একদিন তুমিও বিয়ে করে স্ত্রীকে এমনি করে ফেলে পালাবে।

তারপর ক্লারেন্সের বাবা ভিতরে এল ও আমরা একসঙ্গে খেতে বসলুম। ক্লারেন্সও এই সঙ্গে জুটে গেল। মিষ্টার রোড্‌স্‌ আমার দেশ কোথায় জিজ্ঞাসা করে যখন জানলে যে আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, তখন বল্লে—তুমি খৃষ্টান হয়েছ কি?

আমি স্বীকার করলুম যে তা হইনি। ভদ্রলোক আমার মত বেচারার জন্য মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হয়ে জানালে যে তাহলে আমার মত অসভ্য পৌত্তলিকের যে কোথাও স্থান হবে না।

তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—মিষ্টার রোডস্‌, আপনি কি খৃষ্টান?

খৃষ্টান কি বল্‌ছ, আমি নিজে একজন পাদ্রী। অন্য লোকে যত লোকের আত্মার মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করে তার চেয়ে বেশী লোককে

আমি স্বর্গে পাঠিয়েছি। যাক্, আমার কথা ছেড়ে দাও। আচ্ছা তোমাদের দেশে তোমরা কি পূজো কর—গাছ, পাথর, এইসব তো?

আমি বল্লুম—হ্যাঁ, শুধু গাছ-পাথর নয়, আরও কত কি।

সে তখন একটি চমৎকার কথা বল্লে—তা নাহ্লে আর তোমরা এত তলায় পড়ে আছ? আমাদের মত সভ্য অ্যামেরিকানদের একবার দেখ, জগতে আমরাই সবার চেয়ে ভাল, কারণ আমরা সবাই খৃষ্টান!

কিন্তু যাবার সময় সে ভদ্রলোক মিসেস রোড্সের কাছ থেকে দুটি মোহ্র নিতে যে ভোলেনি সে কথা আজও আমার মনে আছে। মিসেস রোড্স আমায় বল্লে—তুমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না, ও মোটেই পাদ্রী নয়। সেই যারা রবিবারের বিকেলে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে মাথা ফাটায় ও সেই দলের, অন্য লোকের চেয়ে তাতে ওরই উপকার হয়।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—ওকে তুমি ত্যাগ করেছ কেন?

ও যে কাজ করতে চায় না, তার ওপর আমার মাইনের টাকা নিয়ে বাবু মদ খেয়ে ওড়াবেন। এখন ত আর বেশী মদ খেতে পায় না—তাই রবিবারে চেঁচিয়ে মরে। কিন্তু দেখ তোমায় একটা বথা বলে রাখি, টাকার দরকার হলেই আমার কাছে এসো, জানলে? আমায় ভুলো না! তোমার মত ভাল ছেলে আমি কখনও দেখিনি—তুমি সারাদিন কাজ কর—আচ্ছা, তোমার কি খুব মাথা আছে?

আমি বল্লুম—কি জানি! তার সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়া দেখে মনে হ'ল যে সেও তা জানে না।

৫

দিনের পর দিন কেটে গেল। ক্রমে আমার গরমের ছুটির আগে পরীক্ষার দিন এসে পড়ল। লিও এই সময় খুব ঘন ঘন আসত। আমি তার জন্য কলেজ-লাইব্রেরী থেকে বই সংগ্রহ করে আনতুম। একবার তার জন্য Hegel নিয়ে এলুম। সে ক্রমে Aristotle পড়লে, Schopenhaureও বাদ গেলেন না! হেগেলের দর্শন সম্বন্ধে ধারণা এখন খুব পরিষ্কার হয়ে গেল, ভারী সুন্দর ভাবে সে তা বোঝাতে পারত। আমি জানি তার এই দর্শন-পাঠ সাধনার যুগে সে দিনে মাত্র একবার সামান্য কিছু খেয়ে থাকত। একদিন তাকে সে-কথা বলতে সে উত্তর দিলে—ভরা পেটে কি আর দর্শন পড়া চলে—ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি অনাহারে থাকতে পারি!

গরমের ছুটির সময় আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সানফ্রান্সিসকোতে গেলুম ভাল কাজের সন্ধানে। লিও আমার সঙ্গী হ'ল, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করলে যে জীবনে কাজ আর সে কখনও করবে না। সে বল্লে—মহাজনী ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্যে কেন খাটব বল ত?

আমি যখন বল্লুম—বাঃ! কারুকে না কারুকে কাজ ত করতে হবে।

তার উত্তরে সে শুধু বল্লে—বেশ, তোমার খুশী হয় তুমি করগে যাও।

আমি বল্লুম—আচ্ছা, আমিই যাবো।

একটা সারাদিনের কাজও পেলুম; কাজ হ'ল একটা বোর্ডিং-হাউসে ত্রিশ জন লোকের খবরদারি করা, পরিবেশন, বাসন ধোওয়া, বিছানা করা আর টেলিফোন ধরা। কাজ সারতে প্রায় ঘণ্টা দশেক লাগত, কিন্তু তবু ত সন্ধ্যেটা ছুটি থাকত। এই কাজে খাওয়া-থাকা বাদে মাসে কুড়ি ডলার করে পেতুম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় লিওর কাছে যেতুম আর সে যে বই পড়ছে তার সম্বন্ধে আমায় সব কথা বলত।

এর বাড়ীতে এক অদ্ভুত ও বিশ্রী রকমের অর্থলোভের নমুনা দেখলুম। বাড়ীওয়ালীর বৃহৎ পরিবারে কু-পোষ্যের সংখ্যা ছিল বিস্তর। তার স্বামী বা তার ছেলেরা কেহই কাজ করত না, একটি ছেলে আবার রোজ মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরত। তার তিনটি মেয়ের মধ্যে এক-জনের বিয়ে হয়েছিল বটে কিন্তু সেও সপরিবারে সেই বাড়ীতে থাকত। সুতরাং ত্রিশজন ভাড়াটে বাসিন্দার পয়সায় বাড়ীওয়ালী আরও ত্রিশ-জনকে ভাত-কাপড় দিয়ে পুষছিল। যারা কানাকড়ি দিয়েও তাকে সাহায্য করত না, বেচারী বাড়ীওয়ালী তাদেরও ফেলতে পারেনি—স্বামী, পুত্র, নাতিকে আর কোথায় ফেলবে? লোকগুলো সারাদিনই বাড়ীতে থাকত, কিন্তু কুটোটি নেড়ে উপকার করত না, গা ঘামাবার তাদের কী গরজ? টেলিফোনের ঘণ্টা বেজেই চলেছে; সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও একবার ধরবে না। বাপটা ছিল একেবারে পয়লা নম্বরের বদমাস—সারাদিন হল্লা চেঁচামেচি করছেই করছে! এ নরকে বাড়ীওয়ালী যেন দেবীর মত বিরাজ করত। কিন্তু এই কু-পোষ্যের পাল ভরণ-পোষণের জন্য সে কেবলই যে-কোন প্রকারে পয়সা করবার ফিকির খুঁজত।

বাড়ীর মেয়েগুলো ভাড়াটে পুরুষ বাসিন্দাদের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা করত যে তা দেখে আমার ভারী বিরক্ত লাগত। পরে বুঝলুম যে এই কারণেই ভাড়াটেরা এ আস্তানা ছাড়তে চাইত না এবং সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে মেয়েরা নিজে থেকে এমনি করে যার তার সঙ্গে মিশতে চাইত না বা মিশে খুশীও হ'ত না, কিন্তু এই বৃহৎ পরিবার পালনের জন্য বাধ্য হয়ে তাদের এ কাজ করতে হ'ত।

যে-কোন রকমে এরা লোকজনের পয়সা ফাঁকি দেবার চেষ্টা করত। চাকর-বাকর কেউ ছুটি নিলেই মাহিনা থেকে পঞ্চাশ সেণ্ট কাটা যাবে। আমি দেখতুম মাসের শেষে আমার কুড়ি ডলার থেকে প্রায় পাঁচ ডলার

কাটা গেছে, কিছু-বা ধোপা-খরচ বলে, কিছু-বা ভাঙ্গা প্লেটের দরুন, আর কিছু বা ছুটির খাতে! টেবিলে পরিবেশনের সময় আমায় তারা যে সাদা জ্যাকেট পরাতো বা অন্য কাজের সময় যে এপ্রন ব্যবহার করতে দিত মাসের মাহিনা থেকে তার জন্যও কিছু কেটে নিত। দিনের পর দিন তাদের এই চুরি ও উঞ্ছবৃত্তি দেখে আমার মনে হ'ত যে মহাজনী ব্যবস্থা যেন উপরে উঠতে উঠতে এই বাড়ীওয়ালীর মাথায় চড়ে তার চরম সীমায় পৌঁচেছে। যাই হোক সন্ধ্যাবেলাটা আমার ছুটি থাকত; এ কাজে সেই ছিল আমার সব চেয়ে স্থবিধা।

একদিন সন্ধ্যাবেলা লিও এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল, একজন নামজাদা এনার্কিষ্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে। তাকে আমি জেরী বলেই পরিচয় দেবো। এতদিন এরা আমায় বলেছিল যে জেরী হচ্ছে এনার্কিষ্টদের আদর্শ পুরুষ; কাজেই তার কাছে যেতে হবে শুনে আমার মনে ভারী গোলমাল বেধে গেল।

আমি নেকটাইটা ঠিক করে নিচ্ছি এমন সময় লিও বলে উঠল—আরে তুমি যদি ফরসা কলার পরো তাহলে জেরী তোমার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ডই করবে না।

আমি শুনে অবাক হয়ে বল্লুম—কিন্তু রাস্তা দিয়ে কলার না পরে যাবো কি করে?

লিও বল্লে—দেখছ ত, তুমি আজও কি-রকম আসল বুরজোয়া রয়ে গেছ। মহাজনী ব্যবস্থা সবায়ের কাছে যা দাবী করে তোমার মনের ওপর তার কি জোর ছাপ রয়েছে। তুমি আজও দাস, তাই তোমার কথায় দাস-মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে!

বিনা বাক্যব্যয়ে কলার না পরেই পথে বেরিয়ে পড়লুম। গন্তব্য-স্থানে গিয়ে দেখি একটা সস্তা কাফিখানার পিছনের ঘরে আলোর কাছে বসে পক্ককেশ একটি লোক বই পড়ছে।

আমাদের পায়ের শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে সে বল্লে—ভাল ত—আমিই জেরী।

এর সম্বন্ধে আমি এত চমৎকার সব কথা শুনেছিলুম যে তার সামনা-সামনি হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম—মনে যেন সাহসের অভাব হ'ল। সে যে-হাত দিয়ে আমার করমর্দ্দন করেছিল তার মুঠোর জোরের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে এবং পরে যখন সে আমায় হুইস্কি দিলে (জীবনে সেই প্রথম হুইস্কি খেলুম), তখন এনার্কিষ্ট হয়েছি বলে আমার সারা দেহ-মন গর্ব্বে ভরে গেল। আস্ত একটা বোমা ছুঁড়ে কোন এনার্কিষ্টও বোধ করি তত গর্ব্বিত হয় না। হুইস্কির ফ্লাস্কটা আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে সে সেটি নিঃশেষ করলে এবং কথা সুরু হ'ল।

জেরী আমায় জিজ্ঞাসা করলে—এনার্কিজম তোমার এত ভাল লাগল কি করে?

আমি বল্লুম—বাঃ, এই ত ভবিষ্যতের ছবি!

জেরী হেসে বল্লে—না, তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান না দেখছি। ভবিষ্যতের ছবি—ও কথা দুটি ত পুরো বুরজোয়া বুলি—প্রতি গির্জ্জায় রবিবারে রবিবারে এই বুলিই ত শোনা যায়। তুমি আদৌ এনার্কিষ্ট নও। এনার্কিষ্টরা কখনও বড় বড় কথা দিয়ে পুরানো বুলি আওড়ায় না। সে যাই হোক—তুমি ভারতবর্ষে ফিরে যাও না কেন? তুমি আজ যেসব সত্যের খোঁজ করছ, হাজার হাজার বছর আগে তোমার পূর্ব্বপুরুষরা তা লাভ করেছিলেন; বুদ্ধ হচ্ছেন বিশ্বের সকল এনার্কিষ্টের সেরা!

আমি খুব বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না—ঠিক বল?

জেরী—কেন করব না? আমি যেমন ছায়ামূর্ত্তি, ঈশ্বরও তেমনি একটি ছায়ামূর্ত্তি। কাজেই যেখানেই হোক সগোত্র দেখলেই সেলাম দেওয়া ভাল।

আমি বল্লুম—কিন্তু তুমি এনার্কিষ্ট ত বটে!

সে উত্তর দিলে—হ্যাঁ, যদি জীবনের সাতাশটা বছর এক কণা মাত্র কাজ না করে এনার্কিষ্ট হওয়া যায় তবে পৃথিবীতে আমিই একমাত্র এনার্কিষ্ট। গত সাতাশ বছর আমি কোন কাজ করিনি, কারণ আমি শিকাগো সহরে 'Haymarket' ব্যাপারে উপস্থিত ছিলুম। সেই বোমা ছোঁড়ার কথা জানো কি? পুলিশের লোকেরা রাস্তার লোকেদের ওপর বিস্তর জুলুম করেছিল—ব্যাপার কি হয়েছিল জানো? হতভাগা-গুলো দিনে আট ঘণ্টা কাজ করবে বলে আন্দোলন করছিল—আমি তাদের সঙ্গেই ছিলুম—দেখলুম পুলিশ খামকা লাঠি নিয়ে লোকেদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। তারপর সেই হাজার-হাজার মানুষের ভীষণ হট্টগোলের মাঝখানে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হ'ল, আর মজুর-পুলিশ সবাই একেবারে নীরব নিস্পন্দ হয়ে গেল, এক মুহূর্ত্তের জন্যে পৃথিবী কেঁপে উঠল এবং আমিও ভাল করে বুঝলুম।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম—কি বুঝলে? তোমার মতের একটা দার্শনিক ভিত্তি বা অন্য কিছু নেই কি?

জেরী—না, সেই বিরাট শব্দ ও আগুনের ঝলকই আমার মতের আশ্রয়স্থল—সে শব্দটা যেমন তার পিছনের আশ্রয়, এখন মনে হয় সেটা তার সামনের আশ্রয় হোক!

আমার চোখের সামনে জেরী যেন কোন্ অতল গভীরতা থেকে বিরাট জলদেবতার মত আবির্ভূত হ'ল—সাম্‌নে তার বিরাট বিস্ফোরণ ও পিছনে তার মহা-বিদারণ কালভৈরবের প্রমথ সঙ্গীর মত বিরাজ করছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি কি করলে?

জেরী—সেইদিন থেকে আমি কোন কাজই করিনি। আমি ব্রত নিয়েছি যে সামান্য মাত্র অঙ্গ-চালনা করেও আমি মহাজনী ব্যবস্থাকে এ জীবনে তিলমাত্র সাহায্য করব না।

তার কথা ঠিক না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার চলে কি করে?

কেন, লোকেরা আমায় খেতে দেয়—তুমি বলবে আমি ভিক্ষের ওপর, লোকের দয়ার ওপর বাঁচি—তাতে কি? তুমি যদি এনার্কিষ্ট হও তবে যা-ই ঘটুক তাতে তোমার গর্ব্বও থাকবে না, দীনতাও থাকবে না।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম—লোকেরা যা দেয় তাতে কুলোয় ত?

বিলক্ষণ, মানুষ এক অদ্ভুত রকমের দাস—হয় সে ভালবাসার দাস—নয় সে দয়ার দাস! তুমি যদি তার মনে সত্যি দয়া জাগাতে পারো, সে তোমার জন্যে সব করতে পারে!

জেরী বলতে লাগল—আমি ত আর কিছু করি না। শুধু লোকের মনে দয়া জাগিয়ে তুলি। এর জন্যে অবশ্য আমি তাদের ঘৃণা করি—আমি জানি আমায় উপলক্ষ্য মাত্র করে তাদের সে প্রবৃত্তি তারা চরিতার্থ করে; আমি তাদের কাছে কিছু নই অথচ সব সময়ে নিজেকে আমি অপরাধী মনে করে লজ্জিত হই।

আমি তাকে আর একটি প্রশ্ন করলুম—আচ্ছা, যখন তুমি মানুষকে এমনি করে ঘৃণা করো, তখনও কি মানুষের উন্নত ভবিষ্যতে তোমার বিশ্বাস থাকে?

জেরীর উত্তরটি ভারী চমৎকার—আমি লোক সাধারণকে ঘৃণা করি কিন্তু কোন ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা করতে পারি না। যখনই কেউ আমায় দয়া করে নিজের দুর্ব্বলতা দেখায়, আমি তখন সাধারণ মানুষের কথা ভাবি; কিন্তু কেউ যখন উদ্ধত রূঢ় ব্যবহারে আমায় অপমান করে আমি তখন তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখি।

বিস্ময় ও আগ্রহে আমি বল্লুম—সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমি তোমার সঙ্গে যাবো, তোমার কাছেই আমি দীক্ষা নেব, জেরী।

জেরী—না, তুমি তা সহ্য করতে পারবে না।

কেন পারব না?

জেরী—মার খেতে খেতে জেলে যাওয়া, যার-তার কাছে লাথি-ঝাঁটা খাওয়া, আর কখনও বা কারোর দয়ায় প্রচুর খেতে পাওয়া যে কী ভয়নক তা তোমার ধারণা নেই। তুমি কখনও সাতাশ বছর ধরে এসব সহ্য করতে পারতে না। তোমাদের দেশে ধর্ম্মের অঙ্গ বলে প্রচার করে ভিক্ষাবৃত্তিকে উন্নত স্থান দিয়েছে, কিন্তু এদেশে ভিক্ষাকে আমরা এত হেয় অপরাধ মনে করি যে চোরও এ কাজ করতে লজ্জা ও অপমান বোধ করে! তুমি পারবে না—তোমাদের দেশে ভিক্ষা ধর্ম্মাচারের অঙ্গ, কিন্তু এখানে তুমি ভিক্ষা করতে পারবে না—কোন কালেই না।

জেরী কখনও ভারতবর্ষে গিয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করলুম।

সে জানালে—না যাইনি, কিন্তু তাকে উপলব্ধি করা যায়। প্রাচীন হিন্দুদেরও আমি বেশ বুঝতে পারি। তাঁদের সাহিত্যের টুকরো-টাকরা মাঝে মাঝে পড়ে দেখেছি এবং আমার খুব মনে হয়েছে যে তাঁরাই হচ্ছেন বিশ্বের আদিম এনার্কিষ্ট। তোমারই পূর্ব্ব-পুরুষদের একজন না বলেছিলেন—"নেতি, নেতি, নেতি?"

আমি সে-কথা স্বীকার করায় জেরী আমার উপর গর্জ্জন করে উঠল—তবে মরতে এখানে এনার্কিষ্ট হতে এসেছ কেন? আমি যে এনার্কিষ্ট হয়েছি তার কারণ আমি দল চালাতে চাই—উদাহরণস্থল হতে চাই না।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাও?

জেরী—বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ভীষণতার জ্ঞান যাতে বাড়ে সেই পথে; জীবনের নিশ্চিন্ত আরাম থেকে বীরত্বের পথে তোমাদের নিয়ে যেতে চাই।

তাকে নমস্কার করে সে-রাত্রে আমার ছোট বাসাটিতে ফিরে এলুম।

পরদিন তার সঙ্গে আবার দেখা হ'ল এবং বিস্তর আলোচনা চল্‌ল। আমার তখনও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এনার্কিজমের ভিতর দিয়েই মানুষ উন্নততর অবস্থায় পৌছবে—আমি মানতুম যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় চরিত্র গড়ে ওঠে, সুতরাং সে অবস্থার বদল হলে পৃথিবীব উন্নতি হবেই।

জেরীকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা, ডারউইন যে বলেছেন বাঁদর থেকে মানুষ হয়েছে, একথা তুমি সত্যই বিশ্বাস কর ?

জেরী বল্লে—আরে ও কিছু নয়—আমার কি ভয় হচ্ছে জানো—মানুষ দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে বাঁদর হয়ে পড়ছে !

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিবর্ত্তনকেই তো তুমি সভ্যতা বলে স্বীকার করো !

আমাদের সঙ্গে গর্ডন বলে একজন সোশিয়ালিষ্ট ছিল, সে বল্লে যে উক্তিটা স্পেনসারের।

জেরী—আরে তোমার স্পেনসার আবার কে ? গর্ডন যদি তার উক্তি উদ্ধার করে তবে তাতে কিছু নেই নিশ্চয়ই।

গর্ডন খুব রেগে গিয়ে তর্ক সুরু করলে। লোকটা একগুঁয়ে হয়ে কেবল কথা কাটাকাটি করতেই পারে—বক্তব্য তার বিশেষ কিছুই ছিল না। "যদি কথা বলে জিততে চাও তবে তোমারই জিত" বলে জেরী একেবারে মুখ বন্ধ করলে।

গর্ডন আবার বল্লে—প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত পরিবর্ত্তন সাধনই সভ্যতা।

জেরী বল্লে—না—আচ্ছা, একটা গল্প বলি শোন—তারপর আমায় দেখিয়ে বল্লে—এরই এক পুর্ব্বপুরুষ এক নদীর ধারে এসে হাজির হ'ল। ভরা নদী ভয়ঙ্কর বেগে বইছিল—সে লোকটি প্রণাম করে বল্লে—"মাতর্গঙ্গে, তোমার অপরূপ ভীষণতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমি তোমার কূলে বাস করব।" স্রোতের বেগে কূল ভেঙ্গে একদিন তার কুড়ে ঘরটি নদী-

গর্ভে অদৃশ্য হ'ল—লোকটি আবার একটি ঘর তুল্লে। এমনি করে সে নদীর ভীষণতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে লাগল। কিন্তু এই বৃদ্ধ হিন্দুর এক প্রপৌত্র একদিন দেখলে যে নদীর জলে একটা কাঠের গুড়ি ভেসে যাচ্ছে। তাই দেখে তার মাথায় এক নতুন ফন্দি এল ; সে এক সঙ্গে সাত আটটা কাঠ বেঁধে একটা ভেলা তৈরী করে নদী পার হ'ল। তুমি বলবে যে সে-ই সভ্যতা স্বরু করলে। বেশ, তাতে আমার অমত নেই। কিন্তু একে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ত্তন বলে কেমন করে চালাবে ? না, এর ঠিক নাম হচ্ছে আত্মস্মাৎ করা। লোকটি নিজের প্রয়োজনে নদীকে আত্ম-প্রয়োজনে নিয়োগ করল। দেখ্‌লে ত তোমার স্পেন্সার লোকটি ভুল বলেছেন।

গর্ডন—আরে তোমার ও হিন্দু গাঁজাখুরী গল্প রাখো। হিন্দুর মত নিরেটরা তাতে খুশী হতে পারে কিন্তু আমি তাতে ভুলি না—যুক্তি-প্রমাণ চাই।

জেরী—ভাবুক জাতের কাছে পুরাণই ন্যায়শাস্ত্র, আর নিরেট লোকেরা ত ন্যায়শাস্ত্রকেই পুরাণ বলে মনে করে।

গর্ডন খুব রেগে বেরিয়ে গেল।

আমি জেরীকে বল্লুম—আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না যে গর্ডনের কথা সত্যিও হতে পারে ?

জেরী বল্লে—এই সোশিয়ালিষ্ট হতভাগাদের জীবনে একটা অভিশাপ এই যে এরা সব সময়ে সত্যি কথাটাই বলে। ভুল বলবার তাদের সাহসই নেই। কিন্তু গর্ডনের কথা যাক—এরা সমস্তক্ষণই তর্জ্জন-গর্জ্জন-চীৎকার নিয়েই আছে। কোন কালেই বুঝবে না যে জিনিসটা খুবই গভীর—সন্দেহমূলক পদ্ধতি দিয়ে বিশ্বাসমূলক পদ্ধতিকে জয় করা যায় না।

এ-সময় জেরী বা লিও কেউই একটি পয়সা রোজগার করছিল না—

আমার মাইনের কুড়ি ডলার পাবার সময় হয়েছিল। নিয়মমত বাড়ীওয়ালী পাঁচ ডলার কেটে নেবার পর তা থেকে তাদের পাঁচ ডলার দেবার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু না দিয়েও আমার উপায় কি?—তারা আমার মানসিক উন্নতির জন্য সত্যই পরিশ্রম করছিল। সারাদিন তারা পড়ত আর রাত্রে আমায় সেই সব কথা বোঝাত। এমনি করে তাদের কাছে হেগেল ও হিউমের দর্শন পড়লুম —নানারকম সামাজিক মতবাদের খবর, তাদের বিভিন্নতা, বিশেষত্বের কথাও জানলুম।

৬

একদিন মাইনের পনের ডলার নিয়ে লিওর কাছে এলুম; সে বল্লে— আমরা একটা কাজ পেয়েছি এবং নিতে রাজী হয়েছি। আমরা Industrial Worker of the Worldএর (বিশ্ব-কর্ম্মী-সংঘ) তরফ থেকে বক্তৃতা দেবো। সোশিয়ালিষ্ট দলের এই শাখার সঙ্গে আমাদের মতের অনেক মিল আছে। তারা এর বদলে তাদের হল ঘরটায় আমাদের শুতে দেবে। রাস্তায় আর আমাদের ঘুরতে বা ঘুমোতে হবে না—বাঁচা গেল!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তোমরা কি করবে?

লিও বল্লে—আমাদের কাজ হচ্ছে সপ্তাহে দুদিন রাস্তার মোড়ে মোড়ে বক্তৃতা দেওয়া। তা দেখ, দাঁড়াবার জন্যে কাঠের বাক্সটা তুমি নিয়ে যাবে কি?

আমি স্বীকৃত হলুম—বেশ ত, মহাজনী বন্দোবস্ত ধ্বংস করতেই হবে; আমি বাক্স বয়েই তোমাদের সাহায্য করব।

প্রথম বক্তৃতার দিন এল; বাড়ীওয়ালীর কাছ থেকে একটা প্যাক বাক্স চেয়ে নিয়ে কিলমোর ষ্ট্রীটে গেলুম। বাক্সটা ট্রামে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম। লোকেরা আগে মনে করেছিল যে তার মধ্যে বেড়াল জাতীয় কিছু আছে কিন্তু যখন বুঝলে যে বাক্সটা খালি তখন আমার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল,যেন তারা বল্‌তে চাইল যে বাক্সের মত আমার মগজটিও খালি। অবশেষে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে বাক্সটি রাস্তার কোণে রাখ্‌লুম।

লিও তার ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও সমাজ এই তিন আমি লোপ করতে চাই! তার কথার একটি মাত্র শ্রোতা জুটল। আমি মনে মনে বল্লুম—ঐ তিনটি লোপ করে যদি ও একটি লোক পায় তবে বেশী লোক পেতে ও আর কি লোপ করবে? তা ছাড়া লোপ করবার আর রইলই বা কি?

শ্রোতা লিওকে বল্লে—দেখ, তুমি কে বল ত?

লিও—আমি একজন এনার্কিষ্ট।

শ্রোতা—বুঝেছি, কি বলছিলে বল এবার।

লিও—বলে কি হবে? আরও জনপাঁচেক লোক নিয়ে এস দেখি ত?

দীক্ষাগ্রহী লোকটি তাতে রাজী হ'ল। সে পরামর্শ দিলে, আমার কথা শোন, কোন কথা না বলে আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি এস। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম। লিওর দিকে ফিরে দেখি সে বাক্সের ওপর মূর্ত্তির মত সোজা দাঁড়িয়ে আছে! এ ফন্দিতে খুব কাজ হ'ল। বিস্তর লোক ক্রমে ভিড় জমাতে লাগল। লিও হঠাৎ তাদের দিকে হাত ছড়িয়ে আঙুল বাড়িয়ে বল্লে—এই তোমরা সবাই রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সমাজকে পরিপোষণ করছ। লোকগুলো একটু ভয় পেলে কিন্তু খুব উৎসুক হয়ে উঠল।

তারপর লিও তার বক্তৃতা সুরু করলে। তার কথা শুনে লোকেদের

আগ্রহ ক্রমেই বাড়তে লাগল। প্রায় দু'ঘণ্টা বক্তৃতা করার পর লিও খুব গম্ভীরভাবে জানালে, এবার আমার হিন্দু বন্ধু আপনাদের কাছে টুপি নিয়ে যাবেন! আমি দেখলুম, ভিড়ে ভাঙ্গন লাগল এবং বেশীর ভাগ লোকই রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। যারা ছিল তাদের কাছ থেকে প্রায় দেড় ডলার আদায় হ'ল। লিও তখন ঘোষণা করলে—আজকার সংগ্রহ খুবই সন্তোষজনক হয়েছে। আগামী সোমবার রাত্রে আবার আপনাদের কাছে কথা বলতে চাই, সেদিন আমার বন্ধু জেরী "বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন।

কিন্তু সে সপ্তাহ শেষ হবার আগেই অনেক কিছু ঘটে গেল। এর মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ব্যাপারটি হচ্ছে যে, বাড়ীওয়ালী একদিন সন্ধ্যাবেলা আমায় বল্লে, দেখ, আমরা খুব দরকারী কাজে বাইরে যাচ্ছি, তুমি আজ বাড়ীতে থেকে টেলিফোনটা ধরবে কি? কি করি, সে রাত্রে বাড়ীতে থেকে টেলিফোনের খবরদারি করলুম। তারপর উপ্‌রি উপ্‌রি দু'রাত একই অনুরোধ চল্‌ল আর আমিও বাড়ীতে রয়ে গেলুম। এক সপ্তাহের মধ্যে এটা ধরে নেওয়া হ'ল যে সন্ধ্যেবেলা টেলিফোনের খবরদারি করা আমার নিত্য কাজেরই একটা অঙ্গ। কাজটা ছেড়ে দিতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না—একে ত কাজটা ভালই, তার ওপর সন্ধ্যা থেকে ছুটি ছিল। কিন্তু দিনের শেষে কাজ দিয়ে এরা লিও ও জেরীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ প্রায় অসম্ভব করে তুল্লে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা জেরীকে এ-কথা বল্লুম। সে বল্লে—তুমি কাজটা কোনমতেই ছেড়ো না। আমাদের কারুর কোন রোজগার নেই জানো ত!

আমি বল্লুম—বেগার খেটে খেটে বিরক্ত হয়ে গেছি যে।

জেরী—তাহলে আর কি করবে, ছেড়ে দাও। আমার তাতে কিছু এসে যাবে না। তবে আমার কথা শোন, হাতে কিছু জমাও।

এদের ব্যবহারে আমি দিন দিন ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠছিলুম, তাই একদিন যখন বাড়ীওয়ালী বল্লে—দরকারী কাজে আমরা বাইরে যাচ্ছি, তুমি টেলিফোনটা দেখো, আমি বল্লুম—উঁহু, আমারও বাইরে কাজ আছে, এখনি যেতে হবে। টেলিফোন দেখলে চলবে না, যেতেই হবে।

সে বল্লে—তাহলে কাল জন্মের মত এ বাড়ী ছেড়ে যেও।

আমিও জেদ বজায় রাখলুম, বল্লুম—বেশ, কাল কেন, আজ রাতেই যেতে চাই। বেরিয়ে পড়ে আমি লিও ও জেরীর কাছে গেলুম। সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে সে-রাত্রে খুব গরম আলোচনা হ'ল।

জেরী বল্লে—সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মূলে আছে ভয়।

লিওর ধারণা—সে সম্বন্ধের ভিত্তি হচ্ছে অজ্ঞানতা। মানুষ যতই জানে, ততই অসামাজিক হয়ে ওঠে।

আমি বেশ বুঝলুম যে মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধের ভিত্তি বা কারণ দু'জনের আদৌ জানা নেই। বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে ঝগড়া করে সবেমাত্র চলে এসেছি, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটি অতি সূক্ষ্ম, কারণ কাজটি ছাড়বার তখন আমার মোটেই ইচ্ছা নেই। জেরীকে ব্যাপারটা সব খুলে বল্লুম। সে বল্লে—দেখো, কাল তোমার চাকরী থাকবেই। তোমায় তারা ছাড়বে না—তোমার মত অতি বাধ্য একটি নিরেট লোক তারা আর কোথায় পাবে বল? তোমার মধ্যে খুব মুখ বুজে সহ্য করবার শক্তি আছে, কিন্তু সেইটাই তোমার দোষ।

সে রাত্রে বাড়ী ফিরে ঘুমোচ্ছি এমন সময় মনে হ'ল কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। জেগে উঠে শুনলুম, কে একজন দরজা ঠেলছে আর গালাগালি করছে। প্রথমে খুব ভয় পেলেও, ব্যাপারটা শীগ্‌গীরই বুঝেত পারলুম। আমি যে টেলিফোন ধরতে অস্বীকার করেছি সে কথা বাড়ীওয়ালী তার মাতাল ছেলেকে বলে দিয়েছিল; সে বাড়ী

ফিরে আমায় বাইরে বার করে দেবে বলে সারারাত তর্জ্জন-গর্জ্জন করলে, কিন্তু আমায় ত বাগে পেলে না। সকালে উঠে যখন দরজা খুলে বেরলুম, তখন দেখি সে দরজার পাশে মেঝেতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি বাড়ীওয়ালীকে ডেকে আন্‌লুম এবং দু'জনে ধরাধরি করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। এর মধ্যে একবার জেগে সে আমায় বল্লে—হতভাগা কাফের, তোর মাথাটা একেবারে গুঁড়িয়ে দেবো। তখনই আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি বুড়ীকে বল্লুম--আমি আর কাজ করব না, আমায় তোমরা অপমান করেছ—তোমার ছেলে সারারাত আমার দরজার কাছে চেঁচামেচি করেছে, আর হতভাগা কাফের বলেছে।

বুড়ী বল্লে—আমি ত একে অপমান বলে মনে করি না।

আমি বল্লুম—তবে কি করলে অপমান হয় শুনি?

বুড়ী বল্লে—সে যদি তোমায় মারত তাহলে বলতুম অপমান করেছে বটে।

আমি কাজে ইস্তফা দিলুম; মার খাবার জন্যে ত আর অপেক্ষা করতে পারি না।

এইবার জীবনে একটা ভারী দুঃসময় এল। কোথাও একটা কাজ জোগাড় করতে পারলুম না। বিশ্ব-কর্ম্মীসংঘের ঘরে আমরা রাত্রে ঘুমোতে পেতুম কিন্তু এই স্থবিধে নেবার জন্যে আমার বন্ধুদের সপ্তাহে চারটি বক্তৃতা দিতে হ'ত। লিও বলত—নেহাত বাজে আর আত্মম্ভরী লোক ছাড়া আর কেউ সপ্তাহে চারটে বক্তৃতা দিতে পারে না। যাই হোক, ফলে দাঁড়াল এই যে বন্ধুরা যেখানে বক্তৃতা করতে যান আমি বাক্স ঘাড়ে করে সেখানে হাজির হই। দলের কেউ যখন ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, বিবাহ বা কিছুর উচ্ছেদ করতে চান তাঁর নেকনজর পড়ে আমার ওপর। কারণ বাক্সের সঙ্গে আমার সত্বা প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল। তারপর

জেরীর সঙ্গে বিশ্ব-কর্ম্মীসংঘের মনান্তর নিয়ে মতান্তর হয়ে গেল। জেরী বলত যে কর্ম্মীর হাতে কল-কারখানার ভার কোন মতেই থাকতে পারে না, কারণ সেটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অনুযায়ী নয়। আর কর্ম্মীসংঘের কর্ত্তারা জেদ করতেন যে জেরী যেন বক্তৃতায় কর্ম্মীদের এই শাসনের অধিকারের কথা আলোচনা করেন। জেরী অস্বীকৃত হতে তারা বল্লে—তা হলে তোমরা আর এখানে ঘুমোতে পাবে না।

জেরী বল্লে—ভালই হলো, তোমাদের পোকা-মাকড়ের হাত থেকে মুক্তি পেলুম।

তারা বল্লে—বেশ, আমাদের পোকা-মাকড় আমাদের থাক, তোমরা সরে পড়। কাজেই আমরা তিনজনেই সে স্থান ত্যাগ করলুম। আসবার সময় কাঠের বাক্সটা তাদের দিয়ে এলুম, কারণ ঘুমোবার জায়গার জন্যে আর আমাদের বক্তৃতা করবার দরকার ছিল না।

সারারাত না ঘুমিয়ে পথে পথে চলে বেড়ানোর কতকগুলো বিষম অসুবিধা আছে। অবশ্য পার্কে সারাদিন আমরা পড়ে পড়ে ঘুম দিতুম। ক্যালিফোরনিয়ায় তখন গরম পড়েছে; বৃষ্টি ছিল না। কিন্তু পুলিশের লোকের অত্যাচারের আর অন্ত নেই। দেখলুম তারা সর্ব্বক্ষণই আমাদের ঘাড়ে একটা না একটা দোষ চাপিয়েই আছে। তা ছাড়া তাদের সেই একঘেয়ে বুলি "চলো, চলো"—কোথাও জমিয়ে বসতে দেবে না—আমাদের একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লে।

একদিন জেরী মতলব করলে যে আইরিশ জাতীয় আন্দোলন, ফিনিক্স-পার্ক হত্যাকাণ্ড এবং পার্ণেল প্রভৃতির প্রসঙ্গ তুলে পার্কের একটা পুলিশম্যানের সঙ্গে আলাপ জমাবে। তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল না। সেদিন থেকে আইরিশ পাহারাওয়ালাটা আমাদের বন্ধু হয়ে গেল এবং বাগানের একটা বড় ঝোপের তলায় দু'খানা বেঞ্চে আমাদের শোবার

স্থান হ'ল—এতদিন যারা তাড়া দিয়ে জীবনান্ত করছিল তারা আর কেউ বিরক্ত করলে না।

এদিকে ঘুমের চেয়ে খাদ্য সংগ্রহের বন্দোবস্ত নিতান্ত অনিশ্চিত হয়ে উঠল। আমরা তখন ঠিকে কাজ করতুম অর্থাৎ আমি কাজ করতুম আর জেরী ও লিও বেঞ্চে বসে বই পড়ত। একটা বইয়ের দোকানে কাজ পেলুম, দোকানটা সোশিয়ালিষ্টদের। সেখানে দোতলায় পুরানো বই ঝাড়তুম আর তার হিসেব রাখতুম। দিনে আমার প্রায় ঘণ্টা তিনেক খাটতে হ'ত। কিন্তু এই সোশিয়ালিষ্টরা এমন কৃপণ যে আমায় ঘণ্টায় পঁচিশ সেণ্টের বেশী দিত না। যখন আমার হাতে পঁচাত্তর সেণ্ট জমত আমি আর কাজ না করে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে খেতে যেতুম।

জেরী একদিন বল্লে—দেখ খাওয়ার অভাবে সবায়ের শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়বে, কাজেই আমাদের মধ্যে একজনকে কাজ করতেই হবে।

আমি শেষটা বেরিয়ে পড়লুল এবং একটা কাজও পেলুম। এবার খাওয়া-থাকা ছাড়া মাইনে হ'ল পঁচিশ ডলার আর কাজ ছিল আগের বাড়ীর মত। কাজেই কোন গোল হ'ল না। কিন্তু বাড়ীটা একটু রহস্যময় মনে হোল; কতকগুলো সন্দেহজনক লোক কেবলই যাওয়া-আসা করত এবং কেউই এক সপ্তাহের বেশী সেখানে থাকত না। সুতরাং এক সপ্তাহ কাজ করে মাইনে নিয়ে আমি জেরী ও লিওর কাছে ব্যাপারটা সব বল্লুম। তারা বল্লে—জায়গাটা যত সন্দেহজনক হবে, ততই তোমার পক্ষে সুবিধে, কারণ লোকগুলো তোমার কাছে খুব ভাল কাজ দাবি করবে না অথচ বক্‌শিশও পাবে, সময়ও পাবে। লোকগুলো হয়ত দুশ্চরিত্র, আর তুমি তো জানো দুশ্চরিত্র লোক মাত্রেই বেশ একটু মুক্ত-হস্ত হয়ে থাকে।

তারা ঠিক কথাই বলেছিল। এরা যেমন সহজেই খুশী হ'ত পয়সাও দিত তেমনি বেশী। একজনকে আমার খুব ভাল লেগেছিল, তিনি বিধবা এবং নিজের আয়ে থাকতেন। সারা বোর্ডিংয়ে তিনিই কেবল সমস্ত সময় সেখানে বাস করতেন। একদিন দেখি যে সকালের খাবার সময় তিনি লকের (Lock) On Human Understanding পড়্ছেন। নিজেকে দমন করতে না পেরে আমি বলে ফেললুম—আপনি লকের লেখা বুঝতে পারেন?

এর মানে কি? তিনি বলে উঠ্লেন—মনে হ'ল খুব চটেছেন।

আমি তাঁকে শান্ত করবার জন্যে বল্লুম—দেখুন, জেরী আমায় বলেছিল যে বইটা খুব গভীর। যাই হোক্, আরম্ভটা খুব খারাপ হলেও তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছিল; তাতে যেমন সুখ পেয়েছি, জ্ঞান-সঞ্চয়ও করেছি তার চাইতে কিছু কম নয়।

একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—বিবাহ-বন্ধন লোপ করা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

তিনি উত্তর দিলেন—আমার বেলা তাই তো করেছি—আমি তো বিধবা নই, আমি ডাইভোর্স নিয়েছি।

জীবনে এই প্রথম একজনের সঙ্গে কথা কইলুম যে সত্যিই ডাইভোর্স নিয়েছে। কাজেই তাঁকে যে কি বলব তা প্রথমে ভেবে পেলুম না। খামকা জিজ্ঞেস করলুম—আচ্ছা, এ অবস্থায় কি রকম মনে হয়?

তিনি বল্লেন—মনে হয় যেন মুক্তি পেয়েছি। তুমি বলবে কি থেকে মুক্তি পেলুম? তা ঠিক করে আমি বোঝাতে পারব না, কিন্তু একদিন আমার সব কথা তোমায় বলব; কোন মিথ্যার মধ্যে আর জীবন কাটিয়ো না।

আমি মুখস্থ-মত বল্লুম—মানুষ যে মিথ্যার মধ্যে বাঁচে তা শুধু এই মহাজনী বন্দোবস্তের দোষে।

তিনি বল্লেন—তা তুমি যেমন বোঝো। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি Ibsenএর Ghosts পড়েছ? সেই নাটকে একটি মেয়ে যে বহু বৎসর ধরে মিথ্যার মধ্যে বাস করেছিল, সেই কথাই আছে।

এই কথায় আমি ইবসেনের বই পড়তে সুরু করলুম এবং দেখলুম যে তাঁর The Doll's Houseএর সঙ্গে Ghosts নাটকের বিষয়-সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। ইবসেনের উপর আমার শ্রদ্ধা খুবই বেড়ে গেল। কারণ এই মহিলার জীবনে তাঁর মতের জীবন্ত প্রমাণ পেয়েছিলুম।

জেরীকে যখন আমার এই নতুন মহিলা-বন্ধু ও ইবসেনের কথা বললুন, সে বল্লে যে ইবসেন পুরানো হয়ে গেছে। তার কথায় ইবসেন কোন কিছু সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হতে পারেন নি; তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নই উঠিয়েছেন এবং শেষকালে তাঁর প্রশ্ন সম্বন্ধে সন্দেহও জন্মেছিল। তবে একথা ঠিক যে, গ্রীক নাট্যকার সফোক্লেশের পরে ইবসেনের মত কারো রচনা এত সরল নয়।

পরের দিন আমরা সফোক্লেশের বই নিয়ে পড়তে সুরু করলুম।

দু'তিন দিনে যখন আমাদের পড়া শেষ হলো জেরী বল্লে—দেখ্‌লে ত, এর সঙ্গে তুলনায় সেকস্‌পীয়ারের রচনা একটা মুখ্যুর বাজে বকুনি বলে মনে হয় না কি?

আমি বল্লুম—সেকস্‌পীয়ার আবার কি দোষ করলে?

জেরী বল্লে—না, দোষ আবার করবেন কি? কবে তাঁর একটা প্রকাণ্ড বিশ্বাস ছিল যে একই মানুষ দুটো জগৎ বজায় রাখতে পারে। তিনি পৃথিবীর সঙ্গে যেমন রফা করেছিলেন, স্বর্গের সঙ্গেও সেই মত রফা করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেকস্‌পীয়ার এ-জগতের ব্যবস্থা যেমন দেখেছিলেন তেমনি মেনে নিয়েছিলেন, অন্তর জগতের অবস্থার সঙ্গে

বনিয়ে চলেছিলেন। তিনি কোন দিন বুঝতে পারেন নি যে ও দুই ব্যবস্থাই সরল করা বিশেষ দরকার। কিন্তু সফোক্লেশ এ-দুয়ের মিলন সাধন করতে পেরেছিলেন।

আমি আবার তাকে ইবসেনের কথা বলতে জেরী বলেছিল—গ্রীকের মত সমৃদ্ধ ভাষায় যদি রচনা করতে পেতেন এবং সক্রাতেশ ও পেরিক্লেশ প্রভৃতির মত সমকর্ম্মীদের সঙ্গে থাকতে পেতেন, তবে ইবসেন তাঁদেরই মত নিশ্চয়ই বড় হতে পারতেন! কিন্তু ইবসেনের দুর্ভাগ্য যে গ্ল্যাড্‌স্টোনের মত লোকেরাই তাঁর সময়ে জন্মেছিল। কিন্তু দেখ, তোমার পূর্ব্বপুরুষরা এসব কথাই জানতেন এবং সেই জন্যে তাঁদের কোন কষ্টও পেতে হয় নি। তোমার নিজের ঘরে যা আছে তার সন্ধান করতে তুমি আমাদের কাছে এসেছ মনে হলে আমার খুব আশ্চর্য্য বোধ হয়। তোমার এবার দেশে ফেরবার সময় এসেছে।

আমার ফেরবার সময় হয়েছিল বটে তবে দেশে নয়—কলেজে, কারণ গরমের ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

৭

এবার ইউনিভার্সিটিতে ফিরে জীবনটা ভারি নীরস মনে হ'ল। সেই একঘেয়ে প্রাণহীন পাঠ ও দিনের পর দিন শুষ্ক বক্তৃতার চাপে মনটা তিতো হয়ে গেল। সেসব বক্তৃতায় শিক্ষণীয় যে কিছু ছিল না তা নয়, কিন্তু কি জানি কেন আচার্য্যদের জ্ঞানোপদেশে আমার কোন আগ্রহ ছিল না।

মাঝে মাঝে লিও বা জেরী আমার সঙ্গে দেখা করে যেত। 'সীমেষ্টারের' শেষদিকে কলেজ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য আমার কাছে প্রকট হ'ল। যে-কোন ছেলের কাছে এ জীবনের সব চেয়ে বড়

লাভ হচ্ছে পুস্তক-প্রীতি। অবশ্য সত্যিকার ভাল বইয়ের উপর ভালবাসা জাগানো অধ্যাপকের শক্তির বাইরে; ছেলেকে নিজেই এ ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে হয়। জ্ঞানের পিপাসা তো কেউ দিতে পারে না, মানুষ নিজে থেকেই তা উপলব্ধি করে। যে-কোন দশখানার মধ্যে হয়ত একখানা আমার কাছে সত্যিকার বই বলে মনে হ'ত এবং যতই আমি বই থেকে বইয়ের মধ্যে পোকার মত মাথা গুঁজে চলতে লাগলুম, ততই ঠিক বইটি বাছবার মত একটা শক্তিও লাভ করলুম। একখানা ভাল বই পড়তে আমাকে হয়ত দশখানা বই দেখতে হ'ত কিন্তু এমনি করে বেশী বই ঘেঁটে ঘেঁটে পড়ার পিপাসা আমার মিটে গেল—মনে হ'ত সব বইগুলো যেন বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে। একদল কলেজের অধ্যাপকদের 'মামী কেসে' রাখলে যেমন দেখায়, বইগুলোও তেমনি যেন মাথা-ভরা টাক ও চশমা-ঢাকা নিষ্প্রভ চোখ নিয়ে আমার সামনে সার বেধে পড়ে থাকত।

খুবই আনন্দের বিষয় যে সে সীমেষ্টারে মৃতের প্রতি আমার সমস্ত প্রীতি নিঃশেষ হয়ে গেল। একদিন জেরী ও লিও আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। এ সময় আমি খাওয়া-থাকা ও মাসে দশ ডলার নিয়ে একটা বোর্ডিং হাউসে কাজ করতুম। আমার বন্ধুরা যখনই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত আমি তাদের নিয়ে আমার একতলার কুঠুরীতে আসর জমিয়ে বসতুম এবং সেখানে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা চলত। জেরীকে আমার মনের অবস্থার কথা জানালুম। আমি বল্লুম—বইএর মোহ আমার কেটে গেছে।

জেরী বল্লে—বইগুলি হচ্ছে মহৎ চরিত্রের ছায়া মাত্র। যেদিন কোন নবীন মন মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করে, তখন তার বই পড়ার উৎসাহ বা আগ্রহ স্বতঃই কমে যায়। বই ত ছায়া ছাড়া আর কিছু নয় আর ছায়া ভাল লাগে শুধু ছোট ছেলেদের!

আমি প্রতিবাদ করলুম—সেক্‌সপীয়ার, সফোক্লেশেরএর রচনার মত বইও তো আছে।

জেরী বল্লে—তা আছে, স্বীকার করি, কিন্তু পাহাড়কে যেমন বেশী দিন ভাল লাগে না, আজকের দিনে সেক্‌সপীয়ারের কোন নাটকও তেমনি ভালবাসি না। কারণ উভয়ই যেমন বিরাট তেমনই অনাবশ্যক বলে মনে হয়! অথচ নাটকের বাইরে সেক্‌সপীয়ার মানুষটি মনটিকে যেমন প্রশস্ত করে তোলেন তেমনটি আর কিছুতে হয় না। বইয়ের মধ্যে কি আছে না জেনেও তারা যে কি একথা জানবার মানসিক শক্তি যেদিন জন্মায় সেদিন বইগুলো মৃতের স্তূপ বলেই মনে হয়।

লিও বল্লে—বইয়ের আর একটা দিক আছে, তারা বাস্তব জীবনকে ভুলতে সাহায্য করে।

জেরী সে কথায় সায় দিলে—হ্যাঁ, বইগুলো প্রায় আফিমের মত। চীনেম্যানরা গুলি পাকিয়ে খায় আর আমরা তা কাগজের উপর ছড়িয়ে রাখি। একসঙ্গে তাল করে খেলেও যা হয় বর্ণমালা অনুসারে সাজিয়ে রেখেও আমাদের মনের উপর তার সেই ফলই হয়।

আমি এবার বল্লুম—আমি কলেজ ছেড়ে দেবো মনে করছি।

জেরী জেদ করতে লাগল—না, ছেড়ো না, ভবিষ্যতে একদিন মানুষ যেদিন সত্যই বেঁচে উঠবে, তখন এইসব দুর্গের লোকেরা মৃতের পক্ষ নিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে এবং জ্যান্ত লোকেদের জন্য আমাদেরই এ মৃতের দুর্গ ধ্বংস করতে হবে। এই সব জায়গার গুপ্ত রহস্য যারা জানে সেদিন তাদের খুব দরকার পড়বে।

আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছিল তাই প্রস্তাব করলুম যে তিন বন্ধুতে গিয়ে এক ডলারের বিনিময়ে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করা যাক। দলের মধ্যে আমারই অর্থসম্পদ ছিল বেশী, কারণ ডলারটি ছিল আমারই পকেটে।

পথে বেরিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় খেতে বসেছি এমন সময় একটি লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এল, মাথায় তার ঘনদীর্ঘ সুন্দর চুলের ভার, মুখ তার সোনালী দাড়িতে প্রায় ঢাকা। টেবিলের কাছে এসে বল্লে—আরে জেরী যে, কেমন চলছে ?

জেরী তার দিকে ঘুরে সবিস্ময়ে বলে উঠল—তুমি, ফ্রাঙ্ক ! আমি ভেবেছিলুম তুমি অষ্ট্রেলিয়ার জেলে পড়ে আছ !

ফ্রাঙ্ক বল্লে—না, তারা আমায় ধরতে পারেনি আর আমি রাজনৈতিক অপরাধী বলে এঁরাও দয়া করতে পারেন নি। জেরী তখন তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে—তার নাম ফ্র্যাঙ্ক বনিংটান।

বনিংটান বল্লে—আচ্ছা এ ভোজে কি সবাই যোগ দিতে পারে ?

আমাকে দেখিয়ে জেরী বল্লে—একে জিজ্ঞাসা করতে পারো, কারণ ভোজ দেবার শক্তি শুধু এরই আছে।

আমি বল্লুম—নব্বই সেণ্ট প্রায় খরচ হয়ে গেছে, দশ সেণ্টে যদি কিছু হয় ত দেখ।

সে বল্লে—খুব হবে, আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। আজ তিন দিন আমি কিছু খেতে পাইনি।

তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—অষ্ট্রেলিয়ায় তোমার কি হয়েছিল ?

ও সেখানে দুটো সিণ্ডিক্যালিষ্ট ধর্ম্মঘট সুরু করেছিলুম আর একটা কারখানার কাজ ক্ষতি করেছিলুম (স্যাবোটাজ), তাই পুলিশ আমার নামে ওয়ারেণ্ট জারি করে। আমি আগে থেকে সে খবর পেয়ে মার্কিন জাহাজে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি। সিডনী ছেড়েছি প্রায় মাসখানেক আগে। জাহাজে যখন ধরা পড়লুম তখন প্রায় তিনদিন অনাহারে ছিলুম। তারা সামান্য কাজ দিয়ে খেতে দিত, পরে সানফ্রানসিসকোতে নামিয়ে দিয়েছে। আমি ভেবেছিলুম যে আমেরিকায় সোশিয়ালিষ্ট

আন্দোলন খুব জোর চলছে কাজেই যে-কোন জায়গায় দলের লোক বা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

জেরী বল্লে—এখানে সোশিয়ালিষ্ট আন্দোলনের ত সেই বিপদই হয়েছে। কুকুরের গায়ে যত পোকা আছে আমেরিকায় তত সোশিয়া-লিষ্ট জমায়েৎ হয়েছে।

আমি কথা প্রসঙ্গে ফ্র্যাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করলুম যে কাজ করতে গিয়ে তার জীবনে অভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা কিছু লাভ হয়েছে কিনা।

সে বল্লে—না, তেমন কিছু হয়নি, তবে একবার মাথার খুলি দু'জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছিল আর একবার বিস্তর স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলে-মেয়েদের একা আগলাতে হয়েছিল। কারণ সেই সব স্ত্রীলোকদের স্বামীদের পুলিশে গ্রেপ্‌তার করে ছিল। সেবার সব চেয়ে বিপদ হ'ল যে ছোট ছেলে-মেয়েগুলো দুধের জন্যে বায়না ধরতে লাগল আর মেয়েরা খাবারের জন্যে আমায় ব্যস্ত করতে আরম্ভ করলে, অথচ কোন কিছুই দেবার আমার উপায় ছিল না। সে দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেলুম গান গেয়ে। আমরা সকলে মিলে লা মারসেঈ (ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত) গাইতে লাগলুম আর সুরের উন্মাদনায় ক্ষিদের কথা একেবারে ভুলে গেলুম।

জেরী বল্লে—ভাঙ্গা মাথার খুলি নিয়ে তুমি ভাবো কি করে?

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—ওঃ, জীবনে কখনও এ-রকম পরিষ্কার করে ভাবতে পারিনি। ইচ্ছে হয় যে তোমার মাথার খুলিটা তিন জায়গায় ভেঙ্গে যাক, তাহলে আরও ভাল করে ভাবতে পারবে।

জেরী বল্লে—আরে, আমি তোমার ভাঙ্গা খুলির জন্য আপত্তি করছি না, আমি বলছি সোশিয়ালিষ্ট হয়ে এত পরিষ্কার করে ভাবো কি করে? সোশিয়ালিষ্টরা সব দিক গুছিয়ে ভাবে না, তারা যেটুকু জানে তাই জোর করে ভাবে।

ফ্র্যাঙ্ক খবর দিলে যে সে একখানা সোশিয়ালিষ্ট সাপ্তাহিক সম্পাদনের জন্যে মাসে আশী ডলারের এক কাজ পেয়েছে।

জেরী বল্লে—এবার তাহলে আমাদের বেশ চলে যাবে। তারপর আমাকে দেখিয়ে বল্লে—বুঝলে ফ্র্যাঙ্ক, এই ছোকরা কলেজের পড়াশুনা ছেড়ে আমাদের সঙ্গে ভবঘুরে হতে চায়, কিন্তু আমার মনে হয় ওর দ্বারা সে কার্য্য হবে না!

হোবো (hobo) হবার মত আমার যোগ্যতা থাক আর নাই থাক আমি যে কলেজে ফিরে যাবো না সে-কথা আমি জোর করেই জানিয়ে দিলুম। কারণ কলেজের জীবন নিতান্ত নীরস লাগছিল এবং মানুষের জন্য যে প্রাণ উৎসর্গ করতে চাই সে কথাও বল্লুম।

সব শুনে ফ্রাঙ্ক বল্লে—সব জীবনই নীরস এবং মাথার খুলি যদি প্রায়ই ফাটতে সুরু হয় তবে তাও নিতান্ত বিরক্তকর হয়ে উঠে। আর তুমি যে মানুষের জন্য প্রাণ উৎসর্গের কথা বলছ, ও-কথা ভদ্রলোক ছেলে-ছোকরার মুখে এতবার শোনা গেছে যে তাতে ও-কথার কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই—দরকার হোক আর নাই হোক। আর যে মানুষের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে তাকে এত লজ্জাই বা কেন দাও বল ত?

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কিন্তু তুমি কি সে উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করনি?

ফ্রাঙ্ক বল্লে—না, একটা স্বপ্নের জন্য আমি প্রাণ দিচ্ছি এবং আজীবন তারই পিছনে পিছনে ঘুরে মরছি। আমি ভদ্রঘরেই জন্মেছি—আমার পিতামহের অনেক ক্রীতদাস ছিল, আমার বাবা সেই ক্রীতদাসদের অধীনে রাখবার জন্যে অন্তর্যুদ্ধে (civil war) যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি আমায় শিক্ষার জন্য ভার্জ্জিনিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠালেন যাতে আমি ভদ্রলোক হতে পারি, কিন্তু সেখানে বছর চারেক পরে আমি বেশ বুঝলুম যে আমি আদৌ ও-বস্তু হতে

চাই না। কাজেই পূবদিক ছেড়ে পায়ে পায়ে পশ্চিমে ক্যালিফোরনিয়ায় এসে জুটলুম। খাবার খেয়ে দাম না দেওয়ার জন্য আমায় হোটেল-ওয়ালারা লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে—চোর সন্দেহে কত জায়গায় থানায় আমায় আটকে রেখেছে; জঞ্জালের টব থেকে কতবার খিদের জ্বালায় খাবারের টুকরো খুঁটে খেয়েছি, আর পাহাড়ে জঙ্গলে যেখানে পেয়েছি খোলা আকাশের নীচে ঘুমিয়েছি। তাই তোমায় বলছি যে মানুষকে ভালবাসার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কারও ভাল করবার আমার যেমন ইচ্ছা ছিল না, নিজের উন্নতি করবার সাধও আমার ছিল না। কিন্তু হঠাৎ এক প্রেরণা-পত্র এল এবং আমায় বিশ্বাস করতে হ'ল যে মুক্ত আত্মার প্রসারের জন্য একটা উন্নত সামাজিক বন্দোবস্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমার খুব বিশ্বাস যে সেই উন্নত ব্যবস্থায় বর্ত্তমান রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও সমাজ সব ভেঙ্গে-চুরে লোপ পাবে—মুক্তিতে আমার এমনি ধ্রুব ভক্তি যে তার স্বপ্নের দাসত্ব-শৃঙ্খল আমার মনে চেপে বসেছে।

এইখানে কথার স্রোত নানা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হ'ল—বিশেষ করে পড়বার মত বই ও মেশবার মত লোকের কথাই হ'ল। শেষটা উঠল (Nietzche) নিট্জের আলোচনা। আমরা সবাই এ বিষয়ে একমত হলুম যে নিট্জে নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান মহৎ মানুষের অনুসন্ধান করছিলেন এবং তাঁর সমসাময়িক লোকদের কাছে কেবলমাত্র নীতিবান ও সবল লোকের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে এত জোর দিয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন যে লোকেরা তাঁর দৃঢ়তাকে সত্য বলে ভুল করেছে।

জেরী এই বলে প্রসঙ্গ শেষ করলে—যাই বল, লোকটা ফাঁকা আওয়াজ করে বিস্তর। যদি সত্যিই তোমরা বলবান হও, তাহলেও নিজের জন্য যা-কিছু করতে চাও তা করতে পারো না। আর যদি নীতি না মেনে চল তবে কিছুদিন বাদে তোমাদের ভাল-মন্দর জ্ঞান

একেবারেই লোপ পাবে—যেমন দেখ না এই জার্ম্মান! সারা য়ুরোপ সে এই বলে মাতিয়ে বেড়াচ্ছে যে যদি নৈতিক শক্তিতে বলবান কেউ থাকে তবে সে নিজে সেই লোক, তার ফলে য়ুরোপের অন্য সবাই মনে করেছে যে লোকটা নীতিহীন না-হোক শক্তিহীন নিশ্চয়ই।

আমি বল্লুম—যদি আমরা সবাই ঐ কথা বলে দাঁড়াই তবে মানুষের কোন পরিবর্ত্তন হবে না কি?

জেরী বল্লে—মানুষের কথা—রাম! তোমার পূর্ব্বপুরুষরা কি করেছিলেন? তাঁরা ভারতবর্ষের জঙ্গলে বসে ধ্যান করতেন আর তাঁদের চারিদিকে বড় বড় বাঘ হাতী চলে বেড়াত আর গঙ্গার জলের মধ্যে থেকে বড় বড় কুমীর মাঝে মাঝে মাথা তুলে আবার তলিয়ে যেত। তাঁরা কি কোন দিন সেসব গ্রাহ্য করেছেন? তাঁরা এমন সব সত্যের সন্ধানে ছিলেন যা তোমার সমগ্র মানব জাতির চেয়ে অনেক মহৎ, তাঁদের নিজেদের চেয়েও বিরাট এবং সেই জন্যই সত্যের অনুসন্ধানে তাঁরা মৃত্যুর কথাও ভুলে যেতেন। আর আমাদের কি বিপদ হয়েছে জানো—আমাদের জীবন যেমন সামান্য, সত্যও তেমনি সঙ্কীর্ণ। আমরা যেন সব স্বাস্থ্য-নিয়ম-সঙ্গতভাবে তৈরী শূয়ারের খোঁয়াড়, রাজ-পরিদর্শনের অপেক্ষায় খোলা পড়ে আছি। এই যে মানবতার কথা বলছ এর কোন কিছুই তোমার জানা নেই। কোটি কোটি লোকের বুকে যে স্পন্দন চলছে তার ক'টার হিসাব রেখেছ? মানুষের জীবনের হাজার হাজার বছরের ক'টা বছরের খবর করেছ শুনি? আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে মানুষ যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাচ্ছে তার মধ্যে ক'টা লোকের দুঃখ-মোচনের মত আমাদের বুকের পাটা আছে বল ত? অথচ এইখানে বসে আমরা মানুষের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করব বলে বড়াই করি—সত্যের জন্য প্রাণ বলিদানের স্বপ্ন দেখি! এই প্রাণ বলিদান শুনলে আমার গা জ্বালা করে—এ যেন আমাদের

অনুগ্রহ। মানুষকে অনুগ্রহ করতে চেও না, তার চেয়ে রূঢ়তা আর কিছু নেই!

আমি বল্লুম—বেশ, তাহলে সব কথা খুলেই বলি। আমার কাজটি যাবার দাখিল হয়েছে। আমার মনিবরা খরচ বাঁচাতে চায় তাই আমায় জবাব দেবে বলেছে। তা আর কলেজে গিয়ে কি করব?

ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞাসা করলে—কলেজে তোমার কত খরচ লাগে?

আমি বল্লুম—মাসে চল্লিশ ডলার।

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—বেশ, আমার মাইনের অর্দ্ধেক তোমায় দেবো, তুমি তাই নিয়ে কলেজে যাও আর বাকি চল্লিশ ডলারে জেরী, লিও ও আমার খরচ চালিয়ে নেবো।

এ প্রস্তাব শুনে আমি ভয়ানক অভিভূত হয়ে গেলুম এবং মত ফেরাবার জন্য বল্লুম—তার কি দরকার বল? কলেজে যাবার আমার কোন প্রয়োজন নেই। সেসব পণ্ডিতের সাহায্য না নিয়েও তো তোমরা কত কি শিখেছ।

নিজের সুখ-সুবিধা অগ্রাহ্য করেও সে আমায় পড়াবার জেদ বজায় রাখলে। সে বল্লে—সব জিনিস আর জায়গার চেয়ে কলেজটাই ভালো —সেখানে তোমায় কিছু ব্যথা না দিয়ে তোমায় জ্ঞান দেয় কিন্তু এই ভবঘুরে জীবন হচ্ছে জ্ঞানলাভের সব চেয়ে কঠিন পথ। এ-পথে দুঃখের অন্ত নেই, কারণ একবার যে এ পথে নেমেছে তার আত্মসম্মান খর্ব্ব ত হয়ই, ক্রমে ক্রমে সে জ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়। জানো, অনেক সময় কিছুদিন ধরে না খেতে পেয়ে আর খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আমি রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাবার চেয়েছি, দস্তুরমত খাওয়ার শেষে তারাও আমার কাছে দাম চেয়েছে—শেষটা কি হয়ে থাকে সে কথা ত জানো। ফ্র্যাঙ্ক শুধু তার হাতটা নাড়লে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—শেষটা কি হয়ে থাকে বল্লে না?

ফ্র্যাঙ্ক একটু ঘাড় নেড়ে আমায় বোঝালে—আমি তাদের আমায় লাথি মেরে রেস্তোরাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে নিজেকে সমর্পণ করতুম আর তারা খুব খুশী হয়েই তা করত। এবার বুঝেছ ত 'হোবো' হওয়া কা'কে বলে। এর ফলে জীবনের সব চেয়ে বড় সম্পদটি হারাতে হয়—কোন কিছুর উপরে আর বিশ্বাস থাকে না, নিজের মহত্বের উপরেও না।

আমি প্রশ্ন করলুম—এত সব কষ্ট দুর্ভোগের মধ্যে তুমি কেমন করে বেঁচে থাক ?

ফ্রাঙ্ক বল্লে—জীবনকে যেন তোমার বাইরে সরিয়ে রাখতে হয়। তুমি সেই সুদূর ভবিষ্যতের ধ্যান করছ এবং সেই যুগে বাঁচ্‌চ যখন মানুষ দেবতাদের মত বিরাট ও মহৎ হয়ে উঠবে এবং সেই সুদূর ভবিষ্যতে তোমার জীবনধারা অক্ষুণ্ণ চলছে বলে বর্ত্তমান স্থান ও কালকে তুমি আমলই দিতে পারো না। তোমার বুদ্ধি এই ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নের এক সুন্দর আবরণ গড়ে তোলে যা সব সময়ে বর্ম্মের মত তোমার আত্মাকে ঢেকে রাখে।

জেরী বলে উঠল—তা বৈকি, নিজে যে অবস্থায় আছি তা সব চেয়ে বড় ও সবায়ের কাম্য—এই বিশ্বাসের স্বপ্নজালে যদি নিজেকে না ভোলাতে পারবে তবে মানুষের বুদ্ধি আছে কিসের জন্য ?

ফ্রাঙ্ক সে আলোচনা শেষ করে বল্লে—সে যাই হোক, তুমি কলেজে ফিরে যাও, খরচের ভার আমার।

সুতরাং কলেজে আরও একটা সীমেষ্টার কোন মতে টেনে চল্লুম। যখন ছুটি হ'ল তখন সানফ্রানসিসকোতে গিয়ে কাজ নিলুম। এখানে থাওয়া-থাকা ও পঁচিশ ডলারের বদলে সারাদিন কাজ করতে হবে। ফ্রাঙ্কের ধার শোধ ও কলেজের জন্য টাকা জমাচ্ছি মনে করে ভারী একটা আনন্দ পেতুম।

৮

শহরের একটি ছোট সিগার স্টোরে আমরা প্রায়ই সদল-বলে এসে জুটতুম। একদিন সারাদিনের কাজের শেষে আমি সেখানে গিয়ে দেখি বেশ ভিড় জমেছে আর সবাই খুব উদ্বিগ্নভাবে চুপি চুপি কথা কইছে। শুনলুম যে, খবর এসেছে যে এমা গোল্ডম্যান ও রাইটম্যান সান্-ডিগো শহরে গিয়েছিলেন; সেখানকার লোকেরা তাঁদের গায়ে আলকাতরা আর পালক দিয়ে সাজিয়ে লাঞ্ছনা ও অপমানের একশেষ করেছে। নব্যতন্ত্রের দল ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—কি করা যায়!

যাই হোক, আমি আমার দলকে ভিড় থেকে খুঁজে বার করলুম; জেরী বল্লে—এ যুগে এইটাই সব চেয়ে চমৎকার খবর। কারণ এতদিনে এনার্কিষ্টরা জনসাধারণের নেকনজরে পড়েছে। আমাদের আন্দোলনের এর চেয়ে ভাল বিজ্ঞাপন আর কি হতে পারে? কি সৌভাগ্য!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—জেরী, এমনভাবে হোঁদল কুতকুত সাজা খুব বিশ্রী, না?

জেরী বল্লে—তা জানি না, এনার্কিজমের প্রতি আমার ভক্তি কখনও অতদূর গড়ায় নি।

আমি বল্লুম—এখন আমরা কি করব?

জেরী বল্লে—তাই তো, অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। একদিকে 'টাইমস বিল্ডিং' উড়িয়ে দেওয়া ও বহুলোকের প্রাণহানির অপরাধে ম্যাকনামারা ভাইদের লস-এঞ্জেলেস শহরে বিচার স্থরু হয়েছে আর একদিকে এমা ও রাইটম্যান মহা বিপদে পড়েছে। লস-এঞ্জেলস শহরের বুরজোয়াদের দিক থেকে ব্যাপারটাকে দেখলে মনে হয় যেন আলকাতরা প্রভৃতি মাখানো খুব সামান্য রকমেরই শাস্তি। কিন্তু এই

সব বিপন্ন লাঞ্ছিত লোকগুলি আমাদেরই সহকর্ম্মী বন্ধু। তাই কি যে করব তা বুঝতে পারছি না।

ফ্রাঙ্ক বল্লে—জেরী, এখন সান-ডিগোয় গিয়ে বেচারী এমাকে তোমার সাহায্য করা উচিত। মেয়েদের সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করা অত্যন্ত ছোটলোকের কাজ।

জেরী বল্লে—ধরা পড়ে গেলে—সংস্কারের জাল আজও ছিঁড়তে পাবলে না। এনার্কিষ্টরা কি কখনও স্ত্রী-পুরুষের ভেদ স্বীকার করে? তাদের কাছে মেয়েও যেমন পুরুষ এনার্কিষ্টও সেই রকম; কোন প্রভেদ নেই।

ফ্রাঙ্ক বল্লে—বেশ কথা, তুমি তাদের সাহায্য করতে যাবে কিনা?

জেরী বল্লে—হ্যাঁ, যাবো বৈকি।

পরের দিন জেরী বেরিয়ে পড়ল। যখন সে সান-ডিগোয় পৌঁছল তখন সেখানে গোল মিটে গিয়েছিল। তাই সে লস-এঞ্জেলসে চলে গেল। ম্যাকনামারা ভায়েদের যে আদালতে বিচার চলছিল সেখানে গিয়ে তার নিজের ভায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে ভদ্রলোক উকীল এবং ঐ মকদ্দমায় অন্য উকীলদের সঙ্গে তদ্বির করছিলেন। পরের দিন জেরীর কাছ থেকে এই চিঠিখানা পেলুম :—

"স্নেহের লিও, আমার ভাইকে পেয়েছি। অর্থাৎ সেই আমায় পেয়েছে। সে এখানকার উকীল। আমার আর এক ভাই যে জমি-জমার কাজ করে তার মত এটাও খুব বদমায়েস। আমায় আদালতে দেখতে পেয়েই সে সবাইকে জানালে যে আমি তার নিজের ভাই। আমি ভারী অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম, কারণ প্রায় ষোল বৎসর এর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তা ছাড়া যার সঙ্গে আদর্শের বা মতের কোন কিছু মিল নেই সে রকম কোন লোক ভাই বলে ডাকলে মনে মনে ভারী লজ্জিত হতে হয়। কিন্তু এই লজ্জা আর অসোয়াস্তি চরমে

উঠল যখন সে আমায় জামা কাপড় আর জুতো কেনবার জন্য হাতে একশ ডলার গুঁজে দিলে। শিকাগোতে একটা পারিবারিক মিলন হবে, সে আমায় সেখানে নিয়ে যেতে চায়। আমার যদি খুব শীগ্‌গীর Stierner-এর 'Ego and His Own' ও Nietzsche-এর 'Beyond Good and Evil' বই দু'খানা পাঠিয়ে দাও তো বিশেষ উপকার হয়। বুরজোয়া ডালকুত্তা আমার পিছু লেগেছে, ভগবানের দোহাই আমায় বাঁচাও—বই পাঠিয়ো।"

লিও আর আমি চিঠিখানা আবার পড়লুম এবং খুব ভাবলুম যে কি করা যায়। লিও—বল্লে—আমাদের তো টাকা নেই, তার তবু কিছু আছে। তবে তাকে বই পাঠিয়ে কি হবে? আমাদের ত মোটে দু'খানি বই আছে, আর সে দু'খানাই যদি তাকে পাঠিয়ে দিই তাহলে আমরা কোথায় যাই! আর ভায়ের সঙ্গে যদি দেখা হয়েই থাকে তো একটা পারিবারিক অভিজ্ঞতা লাভ হবে, তাতে আর হয়েছে কি?

আমি বল্লুম—তার পরিবার তাকে গ্রাস করবে, তাদের আওতায় সে বুরজোয়া বনে' যাবে আর কি?

লিও বল্লে—আরে, জেরী বছর পঁচিশ কোন কাজ করেনি, একবার তাকে শিকাগোতে টেনে নিয়ে গেলেই কি তার পঁচিশ বছরের নিষ্ক্রিয়তা নষ্ট করা সম্ভব হবে? আমাদের মধ্যে জেরীই হচ্ছে সব চেয়ে দৃঢ়।

লিও ঠিকই বলেছিল। তিনদিনের মধ্যেই জেরীর আবির্ভাব হ'ল, তার পকেট টাকায় ভর্ত্তি। সে বল্লে—যাক, এবার পাঁচ-ছ'মাসের মত একটা ভাল মাথা গোঁজবার স্থান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। আমি সবায়ের জন্য একটা ঘর ভাড়া নেব, যার যখন ঘুমুতে ইচ্ছা হবে সে গিয়ে সেখানে ঘুমোবে। আমরা তিনজন, আর দিনে চব্বিশ ঘণ্টা, কাজেই প্রত্যেকে আমরা আট ঘণ্টা করে ঘুমোতে পারবো। চল, এখনি একটা ঘর দেখা যাক।

আমায় ডেকে জেরী বল্লে—এবার তুমি কাজ ছেড়ে দিয়ে আমাদের এখানে এস, যতদিন হাতে টাকা আছে ততদিন একসঙ্গে পড়া-শুনা করা যাবে। হাত যখন খালি হবে তখন আবার দল ভেঙ্গে যে যার পথ দেখবে।

সেই কথামত আমি বাড়ী গিয়ে মনিবকে জানালুম যে সপ্তাহ শেষে আমি চাকৃরি ছেড়ে দেবো। চাকরিতে জবাব পাবার আগে জীবনে এই প্রথম নিজে ইস্তফা দিলুম বলে মনে মনে খুব গর্ব্বিত হয়ে উঠলুম।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা একত্র হয়ে আমরা নানা আলোচনা সুরু করলুম। এই প্রথমে জেরী তার জীবনের গোপন কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করলে—সে বল্লে—আমাদের পরিবারে বাবা ছিলেন নিতান্ত অস্থির-মতি আর মা ছিলেন চিররুগ্ন। ভাই-বোনে আমরা ছিলুম ছ'জন। নানা দায়ে বাধ্য হয়ে আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে আমরা আমেরিকায় এসে উঠেছিলুম। নিউ ইয়র্কের এক ভাড়াটে ব্যারাকের একতলার ঘরে মা আমার মারা গেলেন। তখন আমার বয়স দশ হবে। দিনটা বৃথা নষ্ট হবে বলে আমরা কেউ স্কুলে যেতুম না, লোকের ফরমাস খেটে, খবরের কাগজ বিক্রি করে যা পেতুম তাতে আমাদের আর তিন বোনের কোন রকমে চলে যেত। এদিকে বাবা কখনও কাজ পেতেন, কখনও বা কিছু পেতেন না। অথচ মনের ঝাল মেটাবার জন্য আমাদের ধরে ধরে মারতেন। একদিন এক বোনের অসুখ হ'ল। আমাদের সবায়ের হাত কুড়িয়ে দেখি যে মোটে আটাশ সেণ্ট আছে। ভাড়াও দিতে হবে। আমরা সবাই আশা করলুম আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করলুম যে বাবা যেন আজ রাত্রে দশ ডলার নিয়ে বাড়ী ফেরেন।

রাত ন'টার সময় বাবা বাড়ী ফিরলেন, গায়ে-মুখে তাঁর হুইস্কির গন্ধ ভর ভর করছে। তিনি পুরো মাতাল হয়ে এসেছিলেন। আমরা

যে টাকা তাঁর কাছে আশা করছিলুম, তা চাইতে লাগলুম। আমাদের বার বার চাওয়াতে তিনি হঠাৎ রেগে উঠে, পাগলের মত ছুটে গিয়ে খামকা বড় ভাইকে মারতে লাগলেন, তারপর মেজো ভাইয়ের উপরে গিয়ে পড়লেন। মারতে মারতে তাঁর যেন খুন চেপে গেল এবং তিনি অসুস্থ বোনটিকে মারতে লাগলেন। এই পাশবিক ব্যাপার দেখে আমি মর্ম্মান্তিক ভয় পেয়েছিলুম, কিন্তু আর সহ্য করতে না পেরে, মরিয়া হয়ে হঠাৎ আমি তাঁকে আক্রমণ করলুম। আমার সর্ব্বাঙ্গে তাঁর ঘুঁসি চড় পড়ছিল, কিন্তু আমি প্রাণপণে তাঁকে আঁকড়ে তাঁর গলা কামড়ে ধরেছিলুম। আমার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তিনি বারবার আমায় মারছিলেন, কিন্তু আমি দাঁত দিয়ে ডালকুত্তার মত কামড়ে ছিলুম—কোনমতেই ছাড়ছিলুম না। ছাড়তে আমার ভয় হচ্ছিল, কারণ আমি জানতুম একবার ছাড়া পেলে সে-দণ্ডে আমার আর নিস্তার থাকবে না। তারপর হঠাৎ মুখে একটা অদ্ভুত স্বাদ লাগল। বাবা খুব কাতরভাবে গোঙাতে লাগলেন। মুখে আমার রক্ত লেগেছিল—আমার মুখ থেকে মন পর্য্যন্ত সব তিতো হয়ে গেল-- বাবার হাতে শাস্তির ভয় না মেনে আমি তাঁকে ছেড়ে দিলুম। বাবা একটু পিছন দিকে হঠে টাল খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি তাঁর দ্বিতীয় আক্রমণের অপেক্ষায় রইলুম। কিন্তু তিনি যখন মাটিতে পড়েও গোঙাতে লাগলেন তখন মন আমার ব্যথায় ভরে গেল। আমার সব ভাই-বোনকে ভয়ানক ভয় পেয়ে ঘরের কোণে চুপ করে জড়সড় হয়ে থাকতে দেখে মন বিরস হয়ে গেল; নিজের উপর একটা ধিক্কার জেগে উঠল।

রাতের অন্ধকারে আমি বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে রাত-ভোর সারা নিউ ইয়র্ক শহর ঘুরে ভোরের বেলা বাড়ী ফিরলুম। ভাই-বোনেরা সবাই অকাতরে ঘুমোচ্ছিল, বাবার বিছানাটা শুধু খালি পড়েছিল।

তাঁকে বাড়ীর মধ্যে কোথাও দেখতে না পেয়ে আমি চারিদিকে খুঁজলুম। সেই গোলমালে আমার অন্য ভাই-বোন ও রুগ্না বোনটিও জেগে উঠল। তারা বল্লে যে আমি বাড়ী ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবাও বেরিয়ে গেছেন। তাঁর আর কোন খবর তারা জানে না। তিনি যে কোথায় চলে গেছেন তা আজ পর্য্যন্ত কেউই জানে না।

এমনি করে তাঁর উধাও হবার পর থেকে সংসারের সব ভার পড়ল আমাদের তিন ভায়ের উপর। দু'টি বছর ধরে আমরা প্রাণপণে বেশ ভাল করেই সংসার চালিয়েছিলুম।

সাগ্রহে লিও বল্লে—তারপর কি হ'ল?

জেরী বল্লে—যা হ'ল তাতে আমার ভবিষ্যৎ ঠিক হয়ে গেল। একদিন কাজের শেষে বাড়ী ফেরবার পথে দেখলুম একদল লোক সার বেঁধে চলেছে। তাদের দেখে ভারী গরীব বলে মনে হ'ল; তারা সব বেকার। তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে তারা চলছিল। বাড়ী গিয়ে ভায়েদের একথা বলতে, তারা ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিলে, বল্লে "তারা যদি কাজ না পেয়ে থাকে তবে সে তাদের নিজেদের দোষে। গোল কি হচ্ছে জান, লোকগুলো কাজ করতে চায় না, কাজেই বেকার বসে আছে।" বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে আমি পার্কের দিকে চলে গেলুম, সেখানে যেতে প্রায় সওয়া এক ঘণ্টা লেগেছিল তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল আর আমিও ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছিলুম। দেখলুম মেয়ে-পুরুষ সব অন্য লোকের বাড়ীর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, বৃষ্টিতে তাদের জামা-কাপড় ভিজে গেছে আর খিদেয় তাদের চোখগুলো যেন সবুজ হয়ে জ্বলছে। জীবনে সেদিন প্রথম বুঝলুম যে ক্ষুধা হচ্ছে একটা সার্ব্বজনীন ব্যাপার। এই ক্ষুধার মধ্যে দিয়ে মানুষ যেমন অনেক সত্যের সন্ধান পায়, অন্য কিছুতে ততটা হওয়া সম্ভব নয়। সেদিন যখন বাড়ী ফিরলুম তখন প্রায় মাঝ রাত্রি।

ভিজে কাপড়-জামা টাঙ্গিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম। পরের দিন আমি আর কাজে গেলুম না।

এবার আমার ভায়েদের কথা কিছু বলি, সংসার পালনের জন্য তারা ত প্রাণপণে পরিশ্রম করতই, আবার নাইট স্কুলেও যেত এবং সর্ব্ব রকমে নিজেদের উন্নতিরও চেষ্টা করত। একজন আইন পড়ে উকীল হবার চেষ্টা করছিল, আর একজন কোন কিছু ঠিক করতে না পেরে ব্যবসা সম্বন্ধে পড়তে স্থরু করেছিল। সবায়ের ভাল ভাবে খাওয়া পরার মত অর্থের অভাব নেই এবং ভায়েরা নিয়মিত কাজ করছে দেখে আমি কাজে যাওয়া বন্ধ করলুম। সব জিনিসের উপর আমার একটা অপরিসীম বিরক্তি এসেছিল এবং ক্রমে মনের মধ্যে এমন একটা শূন্যতা জমে উঠল যা আমি কোন মতেই দমন করতে পারলুম না। খালি বাড়ীতে আমি একা বসে থাকতুম, বোনেরা স্কুল ও ভায়েরা কাজ থেকে ফিরে এলে তাদের খাবার ধরে দিতুম। কেন যে আমি কাজে যাইনি একথা বল্লেও তারা কিছুতে তা বুঝত না। মনের শূন্যতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। আবার রাত্রে পথে পথে বেড়িয়ে বেকার লোক-গুলোকে দেখলুম, রাত্রে তারা যে যেখানে পেয়েছে আশ্রয় নিয়েছে। সারা রাত আমি পথে পথে ঘুরলুম, পরে যখন সকাল হ'ল আমি আর বাড়ী ফিরতে পারলুম না।

এইবার আমার ভবঘুরে জীবনের স্থরু হ'ল। নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে আমি দেশের জিনিসপত্র কেমন করে বাড়্ছে আর দেশের টাকা কেমন করে নানা হাতে ছড়িয়ে পড়ছে সে সম্বন্ধে নানা রকমের গল্প শুনতুম। কিন্তু এমার্সন বলে একটি লোকের Conduct of Life বইখানা যেমন করে আমার সমস্ত মনকে অভিভূত করেছিল তেমন আর কিছুতে নয়। অদ্ভুত লোক এই এমার্সন! অন্তর্যুদ্ধের সময় তিনি বেঁচে ছিলেন অথচ তাঁর রোজ-নামচায় সে সম্বন্ধে খুব সামান্য

মাত্র উল্লেখ আছে। জীবনে এই প্রথম একজনের পরিচয় পেলুম যিনি যুদ্ধের মধ্যে থেকেও তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছেন। আমি এঁর সমস্ত রচনা পড়ে ফেল্লুম। আজ শুধু তাঁর একটি কথা মনে আছে, কোন এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "মানুষকে এককভাবে, স্বতন্ত্রভাবে, ব্যক্তি হিসাবে বিচার করা চাই।" তিনিই আমাকে স্বাতন্ত্র্যবাদী করে গড়ে তুলেছেন।

বছর খানেকের মধ্যেই বোধ হয় আমি শিকাগো গেলুম। হে-মার্কেটের কর্ম্মিক শোভাযাত্রায় যখন বোমা ফেটেছিল, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলুম। মহাজনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কর্ম্মিকের সেই সর্ব্বপ্রথম প্রতিঘাত! তারপর শিকাগো থেকে নিউ ইয়র্কে পায়ে হেঁটে চলে এলুম। এই সময়টা আমি এমার্সনের বইগুলি শেষ করেছিলুম। আবার বাড়ী ফিরে এলুম। একটা কারখানায় কাজ করতুম আর লাইব্রেরীতে পড়তুম। কিন্তু একটা জিনিস আমার মনের মধ্যে ঢুকে সব গোলমাল করে দিলে। আমার বোন দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হলেও আজ সে এমন একটি ছেলেকে ভালবাসে যে তাকে খুব দামী দামী জিনিস উপহার দেয়—আমার গরীব ভায়েরা আজ নানা অর্থকরী কাজে লেগে গিয়ে দিনে দিনে বড়লোক হচ্ছে, আর আমি আজও কারখানায় মজুর রয়ে গেছি।

অকস্মাৎ এই সত্য উপলব্ধি করলুম যে মানুষের স্বভাবের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন হাত নেই। যে অবস্থার মধ্যে আমি বেড়ে উঠেছি আমার অন্য ভাই-বোনও ঠিক সেই অবস্থার মধ্যে মানুষ হয়েছে, কিন্তু তারা সবাই ধন-সম্পদের পিছনে ছুটেছে আর আমি এই বিশ্বের অর্থ ও প্রকৃতি নিয়ে ভেবে মরছি। আমি বেশ বুঝলুম যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দিয়ে মানুষকে বিচার করা যায় না, তাকে জানতে হলে ব্যক্তিগত চরিত্রের হিসাব করতে হয়। বাহ্যবস্তুর প্রভাবে মানুষ গড়ে

উঠে না, তার অন্তর প্রকৃতিই তাকে গড়ে তোলে—এই কথাটাই আমার কাছে ধ্রুব সত্য বলে প্রতিভাত হ'ল। কার কাছে এ কথাটা শিখেছিলুম—এমার্সন না জীবন, কি জানি ?

৯

নিজের বাল্যকাহিনী শেষ হতেই জেরী অধীরভাবে উঠে পড়ে বল্লে—চল, চল, এবার বেরিয়ে পড়ে একটা ঘর ঠিক করে আসা যাক্।

খানিকক্ষণ খোজাখুঁজির পর একটি বাড়ীওয়ালীর দেখা পাওয়া গেল। আমরা মাস ছয়েকের জন্যে একটা ঘর ভাড়া করলুম। বাড়ীওয়ালী লোকটি বেশ মজার। জেরী তাকে জিজ্ঞেস করলে—এক বিছানায় যদি তিনজন লোক ঘুমোয় তাতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি ?

বাড়ীওয়ালী বল্লে—কি বলছেন মশায় ?

জেরী আবার বল্লে--এক বিছানায় তিনজনে ঘুমোতে পারে তো ?

বাড়ীওয়ালী বল্লে—আজ্ঞে, তিনজন মানে, স্বামী-স্ত্রী আর ছোট ছেলে তো ?

জেরী বল্লে—না, না, আমি বলছি কি, একজন প্রথম আটঘণ্টা ঘুমোবে, আর একজন দ্বিতীয় আটঘণ্টা ঘুমোবে, আর একজন ঘুমোবে বাকি সময়টা। তারা একই বিছানায় ঘুমোবে তো! পর পর তিনজন যদি একই বিছানায় শোয় তাতে তোমার আপত্তি আছে কি ?

এবার বাড়ীওয়ালী আমাদের মতলব বুঝতে পেরে বল্লে—আমার ভাড়া পেলেই হ'ল, বিছানায় যার খুশী সে শুতে পারে, আমার তাতে কি ?

জেরী তখন পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে তাকে দিয়ে বল্লে—এই তিন মাসের ভাড়া রইল, এতে হবে তো?

টাকা গুনতে গুনতে সে শুধু ঘাড় নাড়লে।

মাথা গোঁজবার স্থানটুকু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা পার্কে গেলুম। আমাদের এত দিনের আশ্রয় সেই বেঞ্চ দু'খানায় বসে কথা সুরু করলুম। আমাদের এই ভাগের বিছানায় কে যে প্রথম শোবে তাই নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে লাগলুম। অনেক তর্কের পরে শেষে ঠিক হ'ল যে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখা যাক্। প্রথম আটঘণ্টা পড়ল লিওর ভাগ্যে, দ্বিতীয়ভাগ আমার বা ফ্রাঙ্কের এবং সব শেষ জেরীর।

জেরীর কিন্তু এ বন্দোবস্ত মনঃপুত হোল না। সে বল্লে—বাঃ এ ত একটা পুরোদস্তর বুরজোয়া বন্দোবস্ত গড়ে উঠল দেখছি, একেবারে আইন-কানুন-বাধ্য ব্যাপার। আমি এসব মেনে চলব না। ঘর ভাড়া করেছি বলে কি স্বাধীনতা হারাতে হবে নাকি? যার যখন ইচ্ছে হবে সে তখন ঘুমোবে, ব্যস্।

তারপর রেস্তোরাঁয় গিয়ে সবাই কিছু খেয়ে নিলুম। আমি সে রাত্রে আমার কাজের জায়গায় ফিরে গেলুম। তারপর দিনকয়েক আর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়নি। বোধ হয় চতুর্থ দিন রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার উপক্রম করছি এমন সময় আমার একতলা ঘরের জানলার কাঁচে কে যেন আঁচড়াচ্ছে বলে মনে হ'ল। প্রথমটা খুব ভয় পেয়েছিলুম, কিন্তু একটু পরেই বুঝলুম যে বন্ধুদের কেউ হবে। তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখি লিও দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভিতরে ডেকে আনলুম।

সে বল্লে—তোমার কাছে আজ আমায় শুতে দেবে?

আমি বল্লুম—কেন, কি হয়েছে?

সে বল্লে—এখন ফ্রাঙ্কের শোবার পালা, অথচ তার সময় না হলেও জেরীও দেখি এসে জুটেছে। আমি আর কি করি? তিনজনের ত

আর সেখানে জায়গা হতে পারে না, তাই তোমার কাছে চলে এলুম। কি বল, তাহলে শুয়ে পড়ি ?

পররাত্রে ফ্র্যাঙ্ককে আমার কাছে পাঠিয়ে লিও ও জেরী সেই ভাড়াটে ঘরে রইল। কিছুক্ষণ বিছানায় শোবার পর ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—আরে কি কামড়াচ্ছে বল ত? লিও ছাড়া তোমার বিছানায় আর কেউ এসেছিলো নাকি ?

আমি বল্লুম—না তো!

কিছু পরে সে বল্লে—আমি কি ভাবছি জানো? আমার মনে হয় ভাড়াটে ঘরটা উকুন প্রভৃতিতে ভর্ত্তি। লিও অনেক কিছু সঙ্গে করে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেছে, আর আমিও বোধ হয় কতকগুলো সেখান থেকে আমদানি করেছি। যাই হোক, যদি এতকাল ধরে মহাজনী ব্যবস্থা সহ্য করতে পেরে থাকি তো একরাত্রি উকুনের কামড় সহ্য করা কঠিন হবে না।

সুতরাং সারারাত বারে বারে খানিক ঘুমিয়ে ও খানিক গা চুলকে কোন রকমে কাটানো গেল।

ভোরে উঠেই ফ্র্যাঙ্ক বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে দিয়ে সেই শকুনি বুড়ীকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেবার মতলবে। সে খিড়কীর দরজা পার হতে না হতেই দেখি লিওকে সঙ্গে করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসছে।

লিও বল্লে—সর্ব্বনাশ হয়েছে। জেরী গ্রেফতার হয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—গ্রেফতার হ'ল কেন?

সে বল্লে—চুরি করেছে বলে। কাল রাত দশটার সময় জেরী যখন বাড়ী ফিরছিল সে কাছে কোথায় বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলো আর কিছু পরেই একটা লোক ছুটে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দুটো পাহারাওয়ালা সেইসঙ্গে ছুটতে ছুটতে এসে জেরীকে পাকড়ালে; তারা বল্লে যে, এই লোকটাই এইমাত্র একটা দোকান লুট করে এসেছে।

তার সঙ্গে দেখা করবার ও জামিন হবার জন্য আজ সকালে থানা থেকে জেরী আমায় টেলিফোন করেছে।

ফ্র্যাঙ্ক খুব শান্তভাবে বল্লে—যাক্, জেরী যখন একরাত থানায় কাটিয়েছে তখন সে জায়গাটা এবার ছারপোকা-উকুনে ভরল দেখছি, বেচারা চোরগুলো এতদিন অন্ততঃ ঘুমিয়ে বাঁচত, এখন থেকে তার শেষ হ'ল।

লিও বল্লে—কিন্তু এ সম্বন্ধে কি করা যায়?

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—কিছুই কোরো না।

আমি বিস্মিত হয়ে বল্লুম—কিছু না!

ফ্রাঙ্ক বল্লে—না, এই প্রথম নয়; জেরী জীবনে বহুবার পুলিশের হাতে পড়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তারা ওকে সাজা দিতে পারেনি। পরের জিনিস হাত করা ওর ধাতে নেই একথা জানলে, তারা আর কেমন করে তাকে সাজা দেবে বল?

কথাটা আমার মনঃপুত হ'ল না; আমি বল্লুম—কিন্তু বিচার সুরু না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে জেলে পচতে হবে তো?

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—আরে না, তার আগেই ওকে ছেড়ে দেবে। পুলিশ-গুলো একেবারে গর্দ্দভ। জেরীর বদলে আর একটা ভাল লোককে চোর বলে চালিয়ে দেবে। 'হোবো' আর বদমায়েসের মধ্যে তফাৎটা তারা না জানলেও, জেরীকে বেশীক্ষণ আটকে রাখবে না।

আমি আপত্তি তুল্লুম—তাকে জেলে পাঠাতে পারে তো।

ফ্র্যাঙ্ক বলে উঠল—ঘোড়ার ডিম! তারা ও-সব কিছুই করবে না—ওর মত লোককে জেলে রাখতে খরচ অনেক। কাজেই তারা ওকে ছেড়ে দেবে আর আমাদেরই ওকে পুষতে হবে।

উপরে নড়াচড়ার শব্দে বাড়ীর সবাই জেগে উঠছে বুঝে ও আমার কাজ সুরু করবার সময় হ'ল দেখে আমি ফ্যাঙ্ক ও লিওকে চলে যেতে অনুরোধ করলুম।

লিও বল্লে—বেশ, আমি কিন্তু থানায় যাচ্ছি—দেখি কি করতে পারা যায়।

সারাদিন কাজের মধ্যে খুব উত্তেজনায় সময় কাটল। টেলিফোন করে বা আমাদের ভাড়াটে ঘরে গিয়ে কোথাও বন্ধুদের কোন সন্ধান পেলুম না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে রাতে যখন ঘরে বসে বই পড়ছি এমন সময় শার্শির উপরে সেই আঁচড়ের শব্দ পেলুম এবং জেরী ঘরে এসে ঢুকল।

আমি বল্লুম—বাঃ, আমি ভাবছি তুমি এখনও জেলে—তারা জামিন নিয়ে তোমায় ছেড়ে দিলে বুঝি?

জেরী বল্লে—উঁহু, তারা অমনি ছেড়ে দিলে।

—ফ্র্যাঙ্ক আর লিও জানে তো?

—কি জানি, সকাল থেকে তো তাদের দেখিনি।

আমি বল্লুম—সে কি! তারা যে তোমায় জামিনে ছাড়িয়ে আনবে বলে বেরিয়ে গেল।

সে বল্লে—হবে, তারা বোধ হয় এখনও জামিনের চেষ্টায় ঘুরে মরছে। এদিকে পুলিশ আসল চোরকে খুঁজে পেয়েছে, কাজেই নকলটিকে আর তাদের দরকার না হওয়ায় ছেড়ে দিল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার সঙ্গে তারা খুব খারাপ ব্যবহার করে নি ত?

জেরী বল্লে—হুঁ, তুমি ত জানো, রাষ্ট্র চিরকালই একটা মূর্খের কারখানা, যখনই সে তোমার ওপর হাত দেয় তখনই তোমার অনেকটা ক্ষতি করে। বুঝলে, যতদিন না এই রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করছ ততদিন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন স্থান হবে না। দুটো আকাট লোক একটা বিশেষ রকমের উর্দ্দি এঁটে নিজেদের সর্ব্বশক্তিমান ভগবান মনে করে রাস্তার যে-কোন লোকের সঙ্গে যা তা ব্যবহার করতে পারে, একথা

ভাবলে খুব অবাক মনে হয় না কি? অথচ—না,—রাষ্ট্রের উচ্ছেদ অনিবার্য্য; পৃথিবীতে শান্তি ও স্বাধীনতার আশা যদি রাখ তবে সেই সঙ্গে বর্ত্তমান চার্চ্চকেও সমূলে লোপ করতে হবে।

আমি বল্লুম—আচ্ছা, তারা দুজনে কোথায় গেছে বলে তোমার মনে হয়?

সে বল্লে—জানিও না, জানতে চাইও না। হয়ত আমাদের ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। আচ্ছা চল, একবার গিয়েই দেখি হয়ত দুই ভূতে আমার জামিন হবার মত লোকের খোঁজে সারা শহর ঢুঁড়ে মরছে।

দু'জনে পথে বেরিয়ে ফিলমোর ষ্ট্রীটের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে দেখি রাস্তার দুই মোড়ে দুই মূর্ত্তি লোক জমিয়ে জোর বক্তৃতা দিচ্ছে। লিওর কথা শুনতে পেলুম—যতদিন না রাষ্ট্রের উচ্ছেদ সাধন করবে ততদিন স্বাধীনতা পাবার কোন আশা নেই। দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হচ্ছে চরম শক্তি, অপ্রতিহত প্রভু-শক্তি। এ প্রভুত্ব যতক্ষণ যে দেশে অব্যাহত থাকবে সে দেশে ততদিন স্বাধীনতার কোনো স্থান নেই। অতএব, হে ভদ্রমহিলা ও পুরুষগণ, আসুন আমরা মানুষের এই পরম শত্রুর চরম নিপাতের ব্যবস্থা করি।

রাস্তার অপর মোড়ে উল্টান টবের উপর দাঁড়িয়ে ফ্র্যাঙ্ক বলছিল—ভদ্রমহিলা ও পুরুষগণ, আমি আপনাদের কাছে প্রমাণ করে দিয়েছি যে আমাদের এ জীবনে গৌরবের কিছু নেই এবং চার্চ্চ আর স্টেটের (ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র) দুই জাঁতা-কলের মাঝখানে বেঁচে থাকার মত এত বড় লাঞ্ছনারও আর তুলনা নেই। এ জাঁতা-কলে আমরা শুধু যে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছি তা নয়, সত্য-সত্যই লোপ পেতে বসেছি। আমি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি, কিন্তু দুধ দেবার সময় গরুর যতটুকু ব্যক্তিত্ব থাকে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য তার চেয়ে কিছু বেশী নয়, অথচ

গরুর যেটুকু বুদ্ধি আছে সেটুকুও যদি আপনাদের থাকত তবে আজ আপনাদের এ দুর্দ্দশা হ'ত না।

শ্রোতারা খুব স্ফূর্ত্তিতে তার প্রশংসা করতে লাগল।

ভিড়ের মধ্যে জেরী ও আমাকে দেরতে পেয়ে ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—এবার আমি থামব এবং আমার হিন্দু বন্ধু টুপি নিয়ে আপনাদের কাছে যাবেন।

কাজেই আমি টুপি নিয়ে গেলুম ও প্রায় দু'ডলার পাওয়া গেল।

১০

জেরীকে দেখে ফ্রাঙ্ক খুব খুশী হ'ল; বক্তৃতার শেষে লিও-ও এসে জুটল। জেরী তার জেলের অভিজ্ঞতা বলতে স্থরু করলে—

প্রথমবার আমি জেলে যাই শিকাগো শহরে। এক দল মজুরের সঙ্গে আমায় গ্রেপ্তার কোরে আমায় জেলে পুরেছিল। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কিছু না পেয়ে ছেড়ে দেয়। সেই এক মাস জেলে বসে আমি অনেক কথা ভাবতে পেরেছিলুম। যখন ব্যস্ত থাকি তখন তো আর বেশী ভাববার সময় থাকে না, কিন্তু জেলের মধ্যে বন্দীরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় ও আড়ালে ফিস ফিস করে আমায় তাদের জীবনের অনেক কথা বলেছিল। তখনই আমি ভাল করে বুঝেছিলুম যে, আকাশ-ঘেরা পৃথিবীতে বাস করা যেমন সহজ, জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে বাস করবার অভ্যাসও তেমন কঠিন নয়। জেলে মানুষকে অপরাধী করে না তুল্লেও আস্ত জানোয়ার বানিয়ে তোলে নিশ্চয়ই। অবশ্য জানোয়ারের সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করবার তো কোন কারণ দেখি না। জানোয়ার হওয়া মন্দ কি বল? কিন্তু যা বল,

জীবনে যাই ঘটুক, তা মেনে নিয়ে জানোয়ারের মত শান্তভাবে অবস্থার পরিবর্ত্তন করা আমাদের পোষায় না। সে এক দুর্ভাগ্য।

দ্বিতীয়বার আমি জেলে যাই কু-মতলবে বালিকা-হরণের অপরাধে। রাত্রে একটি মেয়েকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে দেখে, তারই খোঁজে একটা বেশ্যাবাড়ীতে গিয়েছিলুম। সে মেয়েটির কথা শুনে তাকে আমার বাড়ীতে এনে, আমি তার খাবার ও শোবার ব্যবস্থা করে দিলুম; কিন্তু যে স্ত্রীলোকটা তাকে ভুলিয়ে এনেছিল সে এসে তাকে নিয়ে যাবার জন্য জবরদস্তি করতে লাগল। আমি তাকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলুম।

এক সপ্তাহের মধ্যেই মেয়ে ভুলিয়ে এনে বিক্রি করবার অপরাধে পুলিশ আমায় গ্রেফতার করলে এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব হ'ল না। তারা বল্লে যে আমিই প্রথমে মেয়েটিকে ভুলিয়ে এনে কু-মতলবে বিক্রি করি। তারপর আবার নতুন করে অন্য লোকের কাছে বিক্রি করব বলে কুটনীর বাড়ী থেকে তাকে চুরি করে এনেছি। তারা আমায় হাতে হাতে ধরে ফেলেছে, দূরে এক জায়গায় আমি নাকি মেয়েটিকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়বার চেষ্টায় ছিলুম। এ কথার তারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলে বিস্তর।

ব্যাপার ত বিলক্ষণ ঘনিয়ে উঠল এবং আমি বেশ বুঝলুম যে নির্দ্দোষ হলেও এবার আমার পরিত্রাণ নেই। তোমাদের একটা সাদা কথা বলি—তুমি যতই নির্দ্দোষ আর শিষ্টশান্ত হও, পৃথিবীর বদমায়েসদের কু-মতলবের হাত থেকে তোমার মুক্তি নেই। সাপ যেমন সহজে মুখ থেকে বিষ বার করে এরাও তেমনি মানুষের ক্ষতি করে।

যাই হোক, ক্রমে বিচার শুরু হ'ল। জুরী বাছাই হ'ল; তিনজন ধনী ব্যবসাদার, একজন পাদরী আর বাকীগুলো সব অন্য কাজ করে। আমার অপরাধ প্রমাণ ব্যাপারটা খুব সহজেই হয়ে

গেল। আমায় দু'জন লোক সনাক্ত করলে—একজন রেলের গার্ড আর একজন বেশ্যাবাড়ীর নিগ্রো দরোয়ান। তারা দু'জনেই সাক্ষী দিলে যে আমি মেয়েটিকে এনেছিলুম এবং আমিই আবার তাকে সরিয়েছি।

ব্যাপারটি তো বেশ জমাট হয়ে উঠল। অপর পক্ষের প্রমাণের মধ্যে কোথাও একটু ফাঁক দেখতে পেলুম না। লাল কাপড় দেখে ষাঁড় যেমন রাগে অন্ধ হয়ে চেঁচায়, ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী তেমনি হুঙ্কার ছাড়তে লাগল। মনে করলুম জুরী তাকে থামিয়ে দেবে, কিন্তু তারা দেখলুম বারোটা শকুনির মত হাঁ করে চেয়ে আছে, তাদের লক্ষ্য শুধু মড়াটা কোন দিকে পড়ে। জজটি যেন বুড়ো ধাঙড়, মৃত্যু ও মৃতের সম্বন্ধে তার অগাধ ঔদাসীন্য। মড়া-ঘাঁটা যেন তার কর্ত্তব্যের অঙ্গ তাই সে মুখ গোমড়া করে বসেছিল। সমস্ত ঘটনাটা যেন একটা বিরাট অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মত গম্ভীর হয়ে উঠেছিল এবং সে অভিনয়ে আধারশায়ী মৃতের ভূমিকায় ছিলুম আমি। আইনের সেই পুঞ্জীভূত ধর্ম্মাচার, যেন পূতবারির মত আমার উপর ক্রমাগত পড়ছিল। সত্যি বলছি, যদি কোনদিন কবরে যাবার বাসনা থাকে তবে সেদিন আদালতে যেও—অন্য কোথাও ধর্ম্মাচার এমন সজীব নয়।

যাই হোক, আমি একটা মতলব ঠাউরে ছিলুম। আমি দেখলুম যে যদি কোন রকমে এ প্রমাণের জাল কাটা যায় তবে সে ঐ নিগ্রোর কথার ফাঁক ধরেই পারা যাবে। আমি আদালতকে জানালুম যে নিগ্রোকে আমি জেরা করতে চাই। ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী একটু হেসে, নিগ্রোকে সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়াবার ইশারা করলেন ও আমি জেরা শুরু করলুম।

—আমায় তুমি কবে আসতে দেখেছিলে?

নিগ্রো বল্লে—গত অক্টোবর মাসে।

—মাসের কোন্ তারিখে?

—তা জানি না মশায়, তবে সেদিনটা ছিল শুক্রবার।

—আমি কি পোশাক পরেছিলুম?

—সে কথাটা ঠিক মনে নেই মশায়।

—আমায় কি রকম দেখাচ্ছিল?

নিগ্রো বল্লে—আজ্ঞে ভদ্রলোকের মত।

—ভদ্রলোক দেখলে তুমি চিনতে পারো?

ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী বল্লেন—এ প্রশ্নে আমার আপত্তি আছে।

জজ বল্লেন—আপনার আপত্তি বজায় রইল।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম—যখন এসেছিলুম তখন আমার হাতে কি ছিল তা তোমার মনে আছে?

—আজ্ঞে না।

—কেমন করে আমি বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিলুম তা মনে আছে কি?

—আজ্ঞে আপনি ভোঁদড়ের মতন চুপিসাড়ে ঢুকেছিলেন।

—আমার গায়ে কি ভোঁদড়ের মতন গন্ধ ছিল?

ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী বল্লেন—এ প্রশ্নে আমি আপত্তি করছি।

আদালত বল্লেন—আপত্তি বাহাল হ'ল।

—আমি বাড়ীতে আসবার পর কি হ'ল?

—আজ্ঞে কিছুই না।

—তোমার ঠিক মনে আছে আমি একা ঢুকেছিলুম?

নিগ্রো বল্লে—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভদ্রলোক না হলেই তো তার সঙ্গে কেউ থাকে না। কত কত ভদ্রলোক রোজই যাওয়া-আসা করে, কিন্তু কারুকে তো একা আসতে দেখি না।

—তাহলে তুমি ঠিক জানো যে আমার সঙ্গে কেউ ছিল না?

—আজ্ঞে না।

—ঠিক তো, আমার সঙ্গে মেয়ে-পুরুষ কেউ ছিল না?

—আজ্ঞে না।

—কিন্তু তুমি আগে সাক্ষী দিয়েছ যে এই মেয়েটি আমার সঙ্গে ছিল।

—আজ্ঞে তা বলেছি বটে।

—তাহলে তোমার কোন্ কথাটা ঠিক? আমি একা এসেছিলুম না এই মেয়েটি আমার সঙ্গে ছিল?

—আজ্ঞে আমি কিছু জানি না—আপনি সব ঘুলিয়ে দিয়েছেন।

—আমি যে এই মেয়েটিকে নিয়ে তোমাদের বাড়ীতে গেছি এ মিথ্যে কথা তোমায় কে শেখালে বল ত?

নিগ্রো যখন সে-কথা বলবার উপক্রম করছে তখন ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী তাড়াতাড়ি উঠে আপত্তি তুললেন, কিন্তু আদালত সে আপত্তি গ্রাহ্য করলে না।

আমি তখন বল্লুম—হুজুর, আমি একে আর বেশী জেরা করতে চাই না; এ নিগ্রোটা মন ঠিক করে কথা বলতে পারছে না, তাই আমার তো খুব বিশ্বাস যে ওকে কেউ এসব কথা শিখিয়েছে।

তারপর রেলের গার্ডকে জেরা করতে আরম্ভ করলুম। সমস্ত জেরায় সে তার আগেকার কথাই বজায় রাখলে। কোন্খানে আমি মেয়েটিকে নিয়ে গাড়ীতে উঠেছিলুম আর লা সাল ষ্ট্রীট বা এঙ্গেলউড কোন ষ্টেশনে নামলুম, এ দুটো কথা সে বলতে পারলে না।

ব্যাপারটা আরও তলিয়ে দেখবার জন্য আরও গোটা দুই সাক্ষীকে জেরা করবার মতলব ছিল। কিন্তু দেখলুম তার কোনই দরকার নেই। নিগ্রোটাকে আবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বল্লুম—সে হাল ছেড়ে কাঁদতে লাগল।—সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বল্লে—আজ্ঞে দয়া করে আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি কিছুই করিনি। আজ্ঞে, ঐ সাহেবরা আমার মাথায় এই সব কথা ঢুকিয়ে দিলে।

কাজেই জুরী নিরপরাধ বলে আমায় ছেড়ে দিলে।

লিও বল্লে—আর সে মেয়েটির কি হ'ল ?

জেরী বল্লে—সে এক বিচিত্র জীবন—তখন তো আমি তাকে আমার কাছে এনে রাখলুম এবং যথাসম্ভব ভদ্র করে তুললুম। তাকে লিখতে পড়তে অর্থাৎ সত্যিকার পড়াশুনা শেখালুম। তারপর মদের দোকানে কাজ নিয়ে দু'বছর ধরে যা পেয়েছি তাতে তাকে ব্যবসা-সম্বন্ধে স্কুলে পড়িয়েছি।

আমি বল্লুম—ছিঃ ছিঃ, কি নোংরা কাজ—এমনি করে, মানুষের সর্ব্বনাশ করা ভারী বিশ্রী—তুমি মদ বিক্রি করেছ ?

জেরী বল্লে—মদে যেমন মানুষের মন মাটি করে, তোমার আইডিয়াতেও যে লোকের সে সর্ব্বনাশ হয় না তা তুমি কেমন করে জানলে ? তফাৎ হচ্ছে যে একটাকে তুমি আইডিয়া বলছ আর অন্যটাকে বলছ নেশা—এই তো !

লিও আবার জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু তারপর সে মেয়েটার কি হ'ল ?

জেরী বল্লে—হাঁ, তারপর সে এক উকীলের কেরানী হ'ল। তারপব নিত্য যা ঘটে থাকে তাই হ'ল। উকীলটা তার সঙ্গে ভালবাসায় পড়ে স্ত্রীকে ডাইভোর্স করে তাকে বিয়ে করে বসল। মেয়েটির বিরাট ও মহান্ ভবিষ্যৎ জীবনের এমন একটা অধম পরিণতি ঘটল। ব্যাপার হচ্ছে যে মেয়েরা মহত্ত্বকে ভয় পায়, তার চেয়ে বিয়ের আশ্রয়ে তারা নিজেদের অনেক বেশী নিরাপদ মনে করে। কেন যে করে তা অবশ্য আমি জানি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—মেয়েদের সম্বন্ধে তুমি কি জানো ?

জেরী বল্লে—খুব সামান্যই। অবশ্য এককালে আমি কয়েকজন বিখ্যাত মহিলাকে জানবার সুযোগ পেয়েছি, যেমন ধর লুইসি মিচেল, ইংলণ্ডের মিসেস অ্যাডামস প্রভৃতি। অ্যানি বেস্যাণ্টের বক্তৃতাও

আমি শুনেছি। তা ছাড়া নানা বিভিন্ন জায়গায় কত মেয়ের সঙ্গে দলের লোক ও বন্ধু হিসাবে মিশেছি কিন্তু আমি দেখেছি যে বেশীর ভাগ মেয়েই কোন মহৎ প্রেরণায় উন্মাদ হয়ে উঠতে পারে না। আইডিয়া নিয়ে মাত্‌তে পারে শুধু পুরুষ। তাই দেখ না, পৃথিবীর যত ভবিষ্যৎ-বক্তা, ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা প্রায় সবাই পুরুষ। কি জানি কেমন করে মেয়েরা বস্তুর সঙ্গে পরস্পরের সম্বন্ধ-গত তত্ত্বটার সন্ধান পায়, কোনটাকে সে আলাদা করে বড় করে দেখতে পারে না। পুরুষ কিন্তু বস্তুকে দেখে তখন যখন সেটা বড় হয়ে দাঁড়ায়, অন্য বস্তুকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে যায়। এই বড় করে তোলবার শক্তি এবং যা-কিছু বিরাটের উপর তার অতি-ভক্তিই পুরুষের উন্মাদনার মূল। তারা যদি সত্যই উন্মাদ না-ও হয়, তবে এমনতর মেতে উঠে যে, পাগল বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—তোমার কথায় মোটেই সায় দিতে পারলুম না। পুরুষদের থেকে মেয়েরা একটুও ভিন্ন নয়। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে, পুরুষরা ভাবতে ভালবাসে যে মেয়েরা ভিন্ন প্রকৃতির। একবার একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এবং আমি তাকে ভালোও বেসেছিলুম। তার অর্থ ছিল কিন্তু আমি ত চিরদরিদ্র। সে মহাজন দলের একজন, আর আমি সে দলের বাইরে। রাস্তার মোড়ে সোশিয়ালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতার সময় একদিন তাকে প্রথম দেখি। তার পর দিন থেকে মেয়েটি প্রায়ই আমার বক্তৃতা শুনতে আসত।

একদিন সে আমায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করলে ; আমি তার বাঁড়ীতে গেলুম। সে বিধবা, কিন্তু তার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল বলে মনে হ'ল। তার সঙ্গে যখন ক্রমে ক্রমে আলাপ জমে উঠল আমি তাকে বার্নার্ডশ'র বই পড়তে দিলুম। ক্রমে আনাতোল ফ্রাঁস প্রভৃতির রচনার সঙ্গেও তার বেশ পরিচয় হ'ল। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে যেমন গাছগুলি সবুজ শোভায় দ্রুত বেড়ে উঠে তারও মনের তেমন প্রসার হতে লাগল—

কত শীগ্‌গির তা নবীন হয়ে উঠল। কিন্তু বুঝেছ তো আমিই তাকে ভালবেসেছিলুম, সে তো আমায় ভালবাসে নি। অন্ততঃ আমি যতখানি বেসেছিলুম ততখানি তো নয়ই। কাজেই একদিন খুব বোকা বনে গেলুম। আমি তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলুম। সে বল্লে, না।

বিয়ে না করবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে—মেয়ে বা পুরুষ যতবার খুশী বিয়ে করতে পারে কিন্তু জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন প্রেমের অভিজ্ঞতা পচা-গলা ফলের মত নেহাত পানসে লাগে। ভালবাসার উপর আর এই সব প্রেমিকাদের উপর আমার বিরক্তি ধরে গেছে। এরা এত স্বার্থপর যে, এরা মনে করে যে তারা যেন নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে। তুমি তো দেখছ, আমি সত্যই এ স্বার্থের ও আত্মম্ভরিতার গণ্ডী কাটিয়ে উঠেছি, নিজেকে বিলিয়ে দেবার আর আমার সাধ নেই।

আমি তখন তাকে বল্লুম—দেখ, তুমি এমনি করে আমায় ব্যথা দিচ্ছ।

সে বল্লে—ভালবাসা লোককে এমনি অভিমানী করে তোলে যে, সবেতেই তারা ব্যথা পায়।

সে রাত্রেই তাকে ছেড়ে চলে এলুম। এক সপ্তাহের মধ্যেই তার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলুম, অমুকের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তুমি গির্জ্জায় এসে আমার পক্ষের একজন সাক্ষী হলে খুব খুশী হবো।

আমি বিস্ময়ে ও ভয়ে ভাঙ্গা গলায় বল্লুম—ধ্যেৎ!

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—সত্যি, সে ঠিক পুরুষের মতই ব্যবহার করেছিল, কারণ আমিও একমাসের মধ্যে বিয়ে করে বসলুম।

আমরা তিন জনেই সবিস্ময়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম—তুমি বিয়ে করেছ?

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—বিলক্ষণ! আমার বিয়ে হয়েছিল, ভালবাসাও পেয়েছিলুম, তারপর এল চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ির পালা।

আমি বল্লুম—তার মানে?

সে বল্লে—ভার্জ্জিনিয়ায় একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, প্রায় আটমাস তার সঙ্গে ঘরও করেছিলুম। কিন্তু তারপর দেখলুম যে, রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে যেমন আমার কোন ভালবাসা নেই, তার সঙ্গেও তাই। যেদিন খুব ভাল করে বুঝলুম যে, আমরা দু'জনেই বিরক্তিকর একঘেয়ে যৌন-কামনার বিড়ম্বনা ভোগ করা ছাড়া আর কিছু পাচ্ছি না, সেইদিনই আমি তাকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। তার যে কি হ'ল সে খবর কেউ জানে না। সে আজ প্রায় ষোল বছরের কথা—কিন্তু তবু আমার মনে হয় যে, যদি আমি ভার্জ্জিনিয়ায় ফিরে যাই তো দেখবো আজও সে আগের মত হৃষ্ট, শান্ত ও বোকা আছে এবং জীবনে সুখী হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এ জীবন যে সুখের নয়, এ যে শুধু জ্ঞানের পথ, একথা সে জানে না।

জেরী বল্লে—এ যে জ্ঞানের পথ এ তোমায় কে বল্লে?

ফ্র্যাঙ্ক—তা জানি না—অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়।

জেরী বলে উঠল—উঁহু, প্রাচ্যের লোকেরা ঠিক কথাটা বলেছেন। কামনার জালে জড়ানো জীবন একটা সমস্যা। জীবনের সমস্যা হচ্ছে, কেমন করে সে এই কামনাকে প্রকাশ করবে। প্রতীচ্যে আমরা জীবনকে জ্ঞানের সমস্যা বলে মনে করি, তাই দেখ না, কি জটটা পাকিয়ে তুলেছি। সমস্ত প্রতীচ্য সভ্যতা, অন্ধতা ও অজ্ঞানতার একটা বিরাট মোহজাল। প্রাচ্যের লোকেরা এত জ্ঞান-জ্ঞান করে মরে না, কাজেই অজ্ঞানতায় তারা এত ব্যথাও পায় না। তারা শুধু তাদের কামনার প্রকাশ নিয়ে আছে। ব্যস্, না-হয় তারা কামনার নিরোধ করতেই ব্যস্ত—তা হলেই সব গোল চুকল, আর আমরাই কেবল আশা-মরীচিকার লক্ষ বিড়ম্বনা ভোগ করে মরছি।

আমি এবার জিজ্ঞাসা করলুম—তাহলে তুমি কি আমায় ভারতবর্ষে ফিরে যাবার পরামর্শ দিচ্ছ?

জেরী বল্লে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আমি বল্লুম—বাঃ, তাহলে মানুষের ভবিষ্যতের কি হবে?

জেরী বল্লে—আরে রাখো তোমার মানুষের ভবিষ্যৎ, মনুষ্যত্বের গর্ব্ব! তোমার এই মনুষ্যত্ব একটা প্রকাণ্ড নর্দ্দমা যার মধ্য দিয়ে আমরা সবাই চলেছি—আমাদের চলার পথ যদি বন্ধ না হয় তবে এ নর্দ্দামা সাফ করবার তো কোন দরকার দেখি না। তোমার মত হলে, আমি আজই ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে গাছের তলায় বসে আমার ধ্যান-ধারণায় মন দিতুম। প্রতীচ্যে আমরা আদর্শ ও ধ্যান-ধারণাকে ব্যবসার বস্তু করে তুলেছি; কবির গড়া কল্পলোককে (Utopia) আমরা এমন বাস্তব করে তুলি যে লোকের আর তাতে কোন আগ্রহ থাকে না। তোমাদের আর কিছু না থাক, ধ্যান করবার শক্তি আছে। আমাদের সেটুকুও যে নেই।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তাহলে নৈরাজ্যের (anarchy) কি হবে? পৃথিবীতে আমরা যে নৈরাজ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করব, তার কি হ'ল?

জেরী বল্লে—দেখ, এনার্কিজম হচ্ছে এমন একটা অবস্থা যা কেবল সুস্থ সবল মনের পক্ষেই পাওয়া সম্ভব! আত্মার এই ভাবকে তোমরা একটা শিক্ষা-সমস্যায় পরিণত করছ কোন্ দরকারে শুনি? সমস্ত প্রতীচ্যে মানুষের মনের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, লোক-শিক্ষা খুব প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু তারা জানে না যে, আকাশের তারা যেমন পেড়ে আনা অসম্ভব, সাধারণ লোককে এনার্কিজম শিক্ষা দেওয়াও তেমনি।

ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞাসা করলে—জেরী, তোমার তৃতীয়বারের জেল্-অভিজ্ঞতার কথা বললে না?

জেরী বল্লে—তৃতীয়বারে আমি সত্যই জেল খেটেছি। আচ্ছা, তোমরা কেউ কখনও চুরি করেছ?

আমি আর লিও এ বিষয়ে আমাদের অক্ষমতা ও অনভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে গম্ভীরভাবে শুধু মাথা নাড়লুম। বয়সে বড় বলে ফ্র্যাঙ্কের এ বিষয়ে কোন বৃথা অভিমান ছিল না, সে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি চুরি করেছিলে জেরী?

জেরী বল্লে—আমি চেক জাল করে পাঁচশ' ডলার চুরি করেছিলুম।

—ধরা পড়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কতদিনের জেল হয়েছিল?

—এক বছরের।

আমি বল্লুম—তুমি একাজ করলে কেন?

—অভিজ্ঞতার জন্য, তা ছাড়া টাকাটাও আমার দরকার ছিল।

—এত টাকায় তোমার আবার কি দরকার হয়েছিল?

—সেই যে কুটনীর কথা বলেছি না, সে মেয়েটার জন্য দাম দিয়েছিল তাই কোনমতে মেয়েটাকে ছাড়তে চাইছিল না; মেয়েটি শহর ছেড়ে গেলে তার হয়ে আমি তাকে পাঁচশ' ডলার দিয়েছিলুম। আমার মনে হ'ল স্ত্রীলোকটাকে শান্ত করবার এইটেই সব চেয়ে ভাল উপায়। মেয়েটি বিয়ে করে ভদ্রজীবনে আশ্রয় পেয়েছে ও আর তাকে যাতে বিরক্ত না করে এই ছিল আমার অভিপ্রায়।

—কার চেক তুমি জাল করেছিলে জেরী?

—দোকানের মালিকের। সে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল, সেই অবস্থায় তাকে বোঝালুম যে সে নিজের হাতে সই করে আমায় পাঁচশ' ডলার দিয়েছে।

—কিন্তু তুমি যে বল্লে তোমার এক বছরের জেল হয়েছিল।

—তা তো হয়েছিল, কারণ সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মালিক আমায় চেক সই করে টাকা দেওয়ার কথা অস্বীকার করলে।

—কাজেই তুমি একবছর জেল খাটলে?

জেরী বল্লে—হ্যাঁ, জেলে একটা জিনিস শিখলুম। মহৎ বা বিপুল প্রেমের শক্তি মানুষের নেই এবং এই অক্ষমতা ঢাকবার জন্যই সে দয়া করতে এত ব্যস্ত। পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষের ওপর খৃষ্ঠধর্ম্মের আধিপত্যের কারণ জান কি? এবা যে যীশুখৃষ্টকে ভালবাসে তা নয়। বহু-ভারাক্রান্ত ব্যথিতের জন্য যীশুর করুণা এদের মুগ্ধ করেছে। জীবন-নাট্যে প্রেমিকের মহৎ ভূমিকা সাধারণ মানুষের জন্য নয়—ভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে সামান্য করুণার মাঝখানেই সে স্ফূর্ত্তি পায় এবং খৃষ্টধর্ম্মের এই সামান্য দিকটাই পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের কাছে মহৎ ধর্ম্ম বলে গৃহীত হয়েছে।

লিও বল্লে—আচ্ছা জেরী তোমার দিক থেকে মেয়েটিকে কি তুমি ভালবাসনি?

জেরী বল্লে—না, তাকে দেখে আমার দয়া জেগেছিল, তাকে ভালবাসিনি। আমার বিশ্বাস খাঁচার পাখী বা কাঠবিড়ালী ছাড়া আমি আর কিছুই ভালবাসতে পারি না।

আমি একবার ফাঁক পেয়ে বল্লুম—সেই যে কুকুরওয়ালার দোকান যেখানে পাখীও বিক্রি হয় সেখানে তোমায় একদিন দেখেছিলুম, তা আমার মনে আছে। মাঝে মাঝে কোন রকমে পয়সা জমিয়ে তুমি

পাখী বা কাঠবিড়ালী কিনে পার্কে ছেড়ে দাও, আমি সে কথাও জানি!

জেরী সে কথা স্বীকার করে বল্লে—হঁ্যা, ও জিনিসটা আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। হাতে পয়সা পেলেই আমি দোকানে গিয়ে যা হোক একটা কিনে বেচারীকে মুক্তি দিই। হায় ভগবান্ আমাদের কেন তুমি মহৎ প্রেমিক করে গড়লে না—আমরা সব সময় করুণা নিয়ে ব্যস্ত। আমরা সবাই যা-কিছু করি এই সামান্য করুণার গণ্ডী ছাড়িয়ে তা কোনদিন উঠে না।

আমি বেশ বুঝলুম যে যদি শহরে থাকি তবে কিছুদিনের জন্য কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে এদের সঙ্গে কথা কয়ে আর ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েই আমার দিন কাটবে। আমি দেখলুম তাতে কিছু লাভ নেই। কাজে গিয়ে টাকা জমিয়ে আমার কলেজের পড়া শেষ করতে হবে। ফ্র্যাঙ্ক অবশ্য মাসে মাসে চল্লিশ ডলার দিতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু তার টাকা নিতে আমার একটুও মন সরছিল না। কাজেই দূরে কোথাও কারখানার কাজ নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবার ইচ্ছা হ'ল। যাবার আগে পুরো একপক্ষ দলের সঙ্গে বেশ স্ফূর্ত্তিতে কাটাব ঠিক করে ফ্র্যাঙ্ককে খবর দিলুম যে সে যেন এ-কয়দিন আর না আসে; কারণ আমি জেরী আর লিওর সঙ্গে এক বিছানায় শোব।

পরের দিন ঘণ্টায় পঁচিশ সেণ্ট হিসাবে কিছু ঠিকে কাজ করে প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় আমি আমাদের ভাড়াটে ঘরে ঘুমোবার জন্য গেলুম। দেখি জেরী মুখ ভার করে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বল্লুম—কি জেরী, ব্যাপার কি?

সে বল্লে—সব ছেড়ে দিলুম।

তার কথার মানে না বুঝতে পেরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—ছাড়লে কি ?

জেরী জোর করে বল্লে—আমি সে বিছানাটা ছেড়ে দিয়েছি !

আমি—তার মানে কি ? আমি যে ঘুমবো বলে এলুম।

ধরা গলায় জেরী বল্লে—তুমি হয়ত বুঝবে না, কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। সকলে মিলে বিছানাটা সমস্ত ক্ষণ ব্যবহার করছি—হয় তুমি, নয় আমি, নয় লিও—কেউ-না-কেউ সেই বিছানায় শুচ্ছি। ব্যাপারটা একবার ভাবো দেখি,—বেচারা বিছানা এ-পর্য্যন্ত একদণ্ড বিশ্রাম পেলে না। তাই আমি ছেড়ে দিলুম। না, না, এমন করে বিছানাও সারাক্ষণ আত্ম-প্রয়োজনে লাগানো উচিত নয়। এইবার কতকগুলো কাঠবিড়ালী কিনে পার্কে ছেড়ে দিতে যাচ্ছি।

আমিও এবার মন বাঁধলুম, জেরীকে বল্লুম—বেশ কথা ; তোমার বিছানা খুশীমত ছেড়ে দেবার অধিকার অবশ্যই তোমার আছে। আমরা সবাই স্বাধীন, কেউ কারো কাছে ধারি না। যাই হোক, আমি কালই কারখানায় চলে যাচ্ছি।

আমার পক্ষে সেইটেই যে বুদ্ধিমানের কাজ জেরী তা স্বীকার করলে। সে বল্লে—দেখ, তুমি অন্য এক সভ্যতার আওতায় মানুষ হয়েছ, এ ভবঘুরে জীবনের কষ্ট সহ্য করবার মত তোমরা টস্ক নও। বাঁচবার জন্য তোমাদের 'আশ্রয় চাই। স্বাধীনতার এই যে কষ্টময় জীবন এ যেন নরক। গায়ে কাপড় নেই, পেটে অন্ন নেই, কিন্তু তবু লোকেরা এই স্বাধীন জীবন ভালোবাসে। আচ্ছা, বিদায়। তুমি তা হলে কারখানাতেই যাও, আশা করি মাঝে মাঝে দেখা হবে।

আমি ক্যানিংটন বলে এক শহরে কারখানার কাজে যোগ দিলুম। দিনে আমাদের বারো ঘণ্টা করে কাজ। দিনে ও রাতে

আলাদা লোক লাগিয়ে কারখানাটা চব্বিশ ঘণ্টাই চলত। চিঠি লিখে লিখে এই কারখানায় আমি রাসায়নবিদের সহকারীর পদ পেয়েছিলুম।

১২

প্রথম দিন ল্যাবরেটরীতে যেতেই প্রধান রাসায়নিক যখন বল্লেন—তুমি এই জিনিসটা বিশ্লেষণ করে দাও তো, তখন আমায় স্বীকার করতে হ'ল যে আমি রসায়নের ক-অক্ষরও জানি না, শুধু কলেজের খরচ জোগাবার জন্যই এ-কাজ আমায় বজায় রাখতেই হবে। ভদ্রলোক আর কি করেন, তবে আমাকে কাজ বজায় রাখবার মত সুবিধা করে দিতে তিনি স্বীকৃত হলেন।

তিনি পরামর্শ দিলেন—দিনে বারো ঘণ্টার বদলে তুমি অন্ততঃ ঘণ্টা চৌদ্দ কাজ কর। তুমি বরং বিশ্লেষণগুলো মুখস্থ করে নাও; সপ্তাহে একঘণ্টা করে খাটলে তুমি শীগগির চিনির রসায়নবিদ বলে নিজেকে চালাতে পারবে। চিনির রসায়ন সম্বন্ধে অনেকেই কিছু জানে না আর যারা তা জানে তারা অন্য কিছু জানে না।

সুতরাং আমি নানা রকম অদ্ভুত কথা মুখস্থ করতে সুরু করলুম। Polarization, evaporation, carbonization, carbonation—কি সব অদ্ভুত বিচিত্র কথার মালা; মনে হ'ত যেন হিমালয়ের তরাই থেকে জানোয়ারের দল সার বেঁধে ঘুরছে। আমার উপরওয়ালা লোকটি ছিল খুব চমৎকার। সে দাম্ভিক, ইতর আর জঘন্য হলেও খুব দয়ালু ছিল। তার হৃদয়টা ছিল হাতীর মত প্রকাণ্ড। মনে মনে সে কর্ম্মী সমবায় নির্দ্ধারিত কাজের পরিমাণে বিশ্বাস করলেও বাইরে বলবার সময় সে বারো ঘণ্টা কাজের পক্ষেই ভোট দিত।

যাই হোক, কারখানার কাজ চলতে লাগল। একবার ভোর ছটায়, একবার দুপুর বারোটায়, একবার সন্ধ্যায়, আর একবার মাঝরাতে, এমনি করে ছ'ঘণ্টা অন্তর কাবখানার বাঁশি বাজত। তপ্ত উনুনের চারদিকে আরসোলার মত এই বিরাট দানবের কুক্ষির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভয়ে ভয়ে বিচরণ করত। সে এক বীভৎস দৃশ্য! এই কারখানার কয়েকজন মজুরের মুখে যে জঘন্য ইতর কথা শুনেছি সে রকম আর কোথাও শুনিনি। আমাদের দেশের সাধারণ ইতরতার কথা আমার জানা আছে, কিন্তু তার মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল। আর এখানে দেখি শুধু নগ্ন কুৎসিত ইতরতার বীভৎস-ক্লিন্ন প্রকাশ।

এ জায়গাটা ছিল ভয়ানক বিশ্রী। এখানকার চারশ মজুরের মধ্যে অধিকাংশই অবিবাহিত, তাই এদেশী ভাষায় একে তারা বলত 'লাল-বাতি পরগণা' (Red light district), কারণ এখানে মাত্র তিনটি ভাড়াটে স্ত্রীলোক ছিল। মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যেত যে দলের পর দল লোক সার বেঁধে এই সব বাড়ীর মধ্যে যাওয়া-আসা করছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনাচারের মধ্যেও কি বিষম পার্থক্য!

প্রাচ্যের গণিকা কলাবিদ রমণী। সে নাচ-গানে সিদ্ধা; নর্ত্তকী ও গায়িকা বলেই তার বেশী আদর, কেবল মাত্র রমণী হিসাবে সে লোককে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু এই জঘন্য কারখানা—শহরে মানুষের দেহ ও মন শূয়ার-গরুর মাংসের মত ব্যবসার বস্তু।

সেদিন ভারী গরম পড়েছিল; রাত্রে কাজের শেষে বিশ্রামের অভাবে খুব ক্লান্ত হয়ে ও অতি শ্রান্তি বশতঃ অনিদ্রায় শহরে টহল দিচ্ছিলুম। পথ চলতে চলতে কি একটা কিনব বলে সামনের দোকানে ঢুকে দেখি একজন স্ত্রীলোক খুব সাজ-গোজ করে দাঁড়িয়ে আছে; আমায় দেখে মিষ্টি হেসে নমস্কার করে চলে গেল।

এমনি করে প্রথম দেখা হবার প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে আবার

তার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বল্লে—এস না, আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে!

বেড়াতে বেড়াতে দু'জনে পার্কে গিয়ে বসে প্রায় ঘণ্টা দুই গল্প করলুম। আমি তাকে আমার কলেজ জীবনের কথা কিছু কিছু বললুম আর সে তার জীবনের লাঞ্ছনার করুণ ইতিহাস আমায় শোনালে—তার ব্যথায় আমার সত্যিকার সহানুভূতি আছে দেখে কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল। শুনলুম সে এক বিখ্যাত নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কিন্তু তার অধঃপতনের জঘন্য কাহিনী আর না-ই বা বল্লুম।

মনে মনে ব্যথার ভার জমিয়ে অসুখী হয়ে কোন লাভ নেই—সত্যি বলছি, আমি মোটেই অসুখী হতে পারি না। আমি যখন এমনি করে কথা বলি তখন মনে হয় যেন সমস্ত সত্যটা বলছি না—এই বলে তার কথা শেষ করে সে বল্লে—আচ্ছা, এইবার আমি উঠি; যাবার সময় হ'ল, প্রায় সাড়ে পাঁচটা বেজেছে।

দাঁড়িয়ে উঠে, সেকহ্যাণ্ড করে সে চলে গেল। আমি বুঝলুম যে শীগগির ছ'টা বাজবে আর যৌন-লালসার শূয়ারের খোয়াড়ে দিনভোর কাজের খোয়ারি ভাঙ্গতে মানুষ-জানোয়ারের দল নারকীয় পঙ্কস্নানে মাতবে! আমি আস্তে আস্তে কারখানায় কাজ করতে চলে গেলুম।

কারখানায় গিয়ে এক তর্ক বাধল। আমার উপরওয়ালা আমায় ডেকে বল্লে যে, রাস্তায় একজন নোংরা স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমায় বেড়াতে দেখা গেছে।

আমি বল্লুম—তাতে হয়েছে কি?

সে বল্লে—হবে আর কি, ঐ স্ত্রীলোকদের পথে দেখলে কেউ তাদের চেনা বলে স্বীকার করে না। বেশ মানলুম যে অনেক লোকই তাদের বাড়ীতে ঐসব স্ত্রীলোককে চেনে জানে। সে ত তাদের চেনবার জায়গা। কিন্তু শহরের রাস্তায়, প্রকাশ্যভাবে যদি কেউ তাদের সঙ্গে

কোন সম্বন্ধ রাখে, তবে সে নোংরা কুকুর ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি যদি আর কখনও ঐ স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাস্তায় ঘুরে বেড়াও তবে তোমার চাকরিও যাবে, এ শহরও ছাড়তে হবে।

আমি জেদ ধরলুম—কিন্তু অনেক লোকই ত ওকে জানে।

সে স্বীকার করলে—জানে, কিন্তু পরগণার বাইরে কেউ তার সঙ্গে কথা কয় না—তার আস্তানার বাইরে সে যদি যার-তার সঙ্গে মিশতে পায় তবে সমাজ ত একেবারে নরক হয়ে উঠবে। তাহলে কিছুদিনের মধ্যে ঐসব স্ত্রীলোকের সঙ্গে ভদ্রমহিলার কোন তফাতই থাকবে না। যাই হোক, সাবধানে থেকো, তা নাহলে শীগগিরই চাকরিটি খোয়াবে—কেউ হয়ত তোমার মাথাটাও ফাটাতে পারে, কে জানে?

এদের নির্লজ্জ ইতরতা ও বেয়াদবির পরিমাণ আমার কাছে দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। লোকের পর লোক এসে আমায় শাসিয়ে গেল যে, যদি আবার আমায় কেউ ঐ স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কইতে দেখে, তবে আমায় শহর থেকে দূর করে দেবে। তার যে জায়গা, তার বাইরে আমি যেন তার সঙ্গে কথা না বলি।

এই সব কথায় আমার রক্ত আগুন হয়ে গেল। আমি বল্লুম—তার কোন জায়গা তা আমি জানি না, তোমাদের মত লোকেরাই সে খবর রাখতে পারে।

হঠাৎ কলের চাকা থেমে গেল—তখন রাত প্রায় বারোটা। কলের গুম গুম আওয়াজ বন্ধ হ'ল, মনে হ'ল যেন এক বিরাট দানব অলসভাবে শুয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে। সব আলোগুলো নিভে গেল এবং সর্ব্বত্র ছোট ছোট বাতি নিয়ে লোকেরা এঞ্জিনের গলদ খুঁজে দেখতে লাগল। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, এঞ্জিন থামল কেন?

ক্রমে জানা গেল যে, 'ডাইনামো' ঘরে একটা টিকটিকি ঢুকে পড়েছিল; তাই এই বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটেছে! এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় আমার কোন দখল না থাকায়, তারা যা আমায় বল্লে তার মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝলুম না। কারখানা ঘরের সেই অন্ধকারে ছোট ছোট বাতির আলোতে আমি রাসায়নিককে শেকসপীয়র থেকে আবৃত্তি করে শোনালুম; "We are such staff as dreams are made on and our little life is rounded with sleep."

আমার উপরওয়ালা তা শুনে বল্লে—অত কাব্যি কিসের জন্যে শুনি?

আমি বল্লুম—গানের উৎস হচ্ছে ব্যথা এবং ব্যথার মুক্তি গানে।

সে বল্লে—ছোকরা, গানে তো আর রুটি মেলে না।

—না, কিন্তু মনের রস জোগায়।

কেজো লোকটি বলে উঠল—তাই নাকি হে? বাবাজী, তুমি কেমিষ্ট্রির ক-অক্ষর জানো না অথচ কাব্যিতে ত বেশ পাকা, এবার কেমিষ্ট্রি শিখে অন্ন কর না কেন? কাব্যি করে ত পেটে না খেয়ে, টেনা পরে আছ; একেবারে বুভুক্ষু ইঁদুরের হাল হয়েছে, সে কথা কি কোনদিন ভেবেছ?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তাতে লাভ কি বল?

সে বলতে লাগল—কি, ওমনি করেই কথা বলবে নাকি? বেশ, তাহলে একটা হল ভাড়া করে মনের সাধ মিটিয়ে বক্তৃতা করগে। আমি যখন কলেজে কেমিষ্ট্রি পড়তে গেলুম, তারা বল্লে, কাব্যও পড়তে হবে—মজা মন্দ নয়, তুমি চাও কেমিষ্ট্রি নিতে আর তোমার জন্য শেকসপীয়র, ডিকেন্স আরও কত শৌখীন রচনা বরাদ্দ হ'ল। কাজেই কি জগা-খিচুড়ীই তারা বানিয়ে তোলে।

আমি বল্লুম—বুঝছ না, জবরদস্তি করে শেকসপীয়র পড়ালে কোন মতেই তা কারুর ভালো লাগে না। তা ছাড়া কোন বিষয়ে পরীক্ষা

দিয়ে পাশ করতে হলে সে বিষয়টা এমন নীরস হয়ে ওঠে যে আজীবন তুমি তার উপর বিরক্ত হয়ে থাকবে।

কারখানার বাঁশি বেজে উঠল, বিজলী বাতিগুলো জ্বলে উঠল। সেই মহাদানব কিছুক্ষণ হাঁপ নিয়ে গোঙ্গাতে লাগল এবং তারপর এঞ্জিনের চাকাগুলোর ভীষণ আওয়াজে অন্য সব শব্দ চাপা পড়ে গেল।

কি জানি কেন, পরের দিন ক্যানিংটনের কাজ ছেড়ে প্রথম ট্রেনেই সানফ্রানসিসকোতে ফিরে গেলুম।

১৩

সানফ্রানসিসকোতে এসে দেখি এর মধ্যে কলেজ খুলে গেছে। কাজেই মাইনে দিয়ে পড়া স্থরু করলুম। এবার এক নিগ্রো স্ত্রীলোকের অধীনে খুব ভাল কাজ পেলুম, সেই ঘর সাফ করা, বাসন ধোওয়া আর পরিবেশন করা। এনার্কিজমের প্রতি আমার আগ্রহের এবার অবসান হয়ে আসছিল। আমি উপলব্ধি করছিলুম যে একটা নব্য দর্শন আবিষ্কার করা ছাড়া আমার অন্য কোন পন্থা নেই এবং সে দর্শনে মানুষের বাস্তব উন্নতির স্থান খুব কমই থাকবে। এই সময়টাতে আমি আবার নূতন করে যেন ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করতে লাগলুম, নিত্য নূতন আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতায়।

তখন উনিশ শ' বারো খৃষ্টাব্দের হেমন্তকাল। ভারতবর্ষে রাজ-নৈতিক ও নানাবিধ আন্দোলন নানা আকারে নিজেকে প্রকাশিত করছে। বিদ্যা ও জ্ঞান সংগ্রহের লোভে দলে দলে ভারতীয় ছাত্রেরা এখানে এসে জুটছিল এবং যতই এদের আসতে দেখতুম ততই আমার মনে হ'ত যে এরা মরুভূমির সুদূর মরীচিকায় পিপাসাশান্তির ব্যর্থ আশায় ছুটেছে।

এতদিন ধরে আমি পাশ্চাত্য সভ্যতার তলানি ময়লাটা পর্য্যন্ত আকণ্ঠ পান করেছি, এর ভিতরকার সমস্ত নোংরামি, জীবনের প্রতি অগাধ ঔদাসীন্য, এর সমস্ত জুয়াচুরী, ভণ্ডামি সবই আমার কাছে ধরা পড়েছে। সত্য ভারত সে-যুগে যে সমস্ত ভুল করেছে সুসভ্য আমেরিকাও সেসব ভুল-চুক-গ্লানির হাত থেকে রেহাই পায়নি। অথচ সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উভয় সভ্যতাতেই বিরাট একটা কিছু গড়ে তোলবার মালমশলার অভাব ছিল না।

যতগুলি ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল তারা সবাই স্বদেশপ্রেমিক। তারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চায়; যেন রাজনৈতিক অধীনতা-পাশ-মুক্ত হলেই ভারতবর্ষ তার ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বপ্রকাশ হয়ে উঠবে। এই সব ছেলেদের অনেকের সঙ্গে আমার বহু তর্ক হয়েছে। এরা মনে করত যে ভারতের যদি স্বাধীন শাসনতন্ত্র, নিজের সৈন্য ও জাহাজ ও কতকগুলি কল-কারখানা থাকত তবে সে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর বহু সভ্যদেশের অন্যতম হয়ে উঠত।

একজন ভারতীয় বিদ্রোহ-পন্থীর কথাই বলি। সানফ্রানসিসকোর অনেকেই তাকে আজও ভোলেনি। প্রত্যেক ভারতীয় বিশ্বাস-ঘাতকের মুণ্ডচ্ছেদনের তার যেমন অদম্য আগ্রহ ছিল, প্রত্যেক ইংরেজ কর্ম্মচারীর প্রতিও তেমন একরকম নেকনজরে চাইবার তার উৎসাহ ছিল প্রচুর। সে লোকটি ভারতব্যাপী যে বিরাট হত্যাকাণ্ডের স্বপ্ন দেখত তাতে তাকে আমার 'মরণের মহাকবি' বলে মনে হ'ত। দেশভক্তিরূপ দেবতার চরণে সে বিরাট অর্ঘ্যের মত প্রকাণ্ড মৃত্যু-হোমের ধ্যান কোরত। দেশকে রাজনৈতিক নরকের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করতে ও নূতন নরক নিবারণ-কল্পে সে ইংরাজ-সৈন্য-ভর্ত্তি কেল্লা-গুলো উড়িয়ে দেবার নানা অদ্ভুত উপায় নিজের বুদ্ধিতে প্রায়ই

আবিষ্কার করত, আর মাঝে মাঝে স্বাধীন জাতির মধ্যে থাকবার তার আনন্দ কাব্যের ছন্দে মূর্ত্ত হয়ে উঠত। সে ভারী সব রমণীয় হত্যাকাণ্ডের ও কমনীয় সংহার-লীলার কল্পনায় মশগুল থাকত।

একদিন আমি তাকে বল্লুম—আচ্ছা দেখ, ইংরেজের বদলে আমাদের এ হত্যাকাণ্ড দেশে চালিয়ে লাভ কি? হয়ত আমাদের অত্যাচারটা একটু উদারনৈতিক হতে পারে। কিন্তু তাদেরটা ত বেশ প্রয়োজনপন্থী ও কার্য্যকরী বলেই মনে হয়।

সে বল্লে—তাদের সংহারলীলা ক্রমাগতই চলেছে কিন্তু আমাদেরটা কেবল মাত্র ক্ষণিক ও বাস্তবিক অনিবার্য্য। হত্যার মধ্যেও অনপচয়ের কথাটা ভাবতে হবে। যদি মাত্র কয়েক শত লোককে বধ করে তুমি একটা স্বাধীন ভারত সৃষ্টি করতে পারো তাহলে বধ করা উচিত বৈকি। আমি শুধু লাভালাভের হিসাব থেকে কথাটা বলছি।

আমি বল্লুম—আমার ভাবনা তো ঐখানেই। তোমার এই অনপচয়-তত্ত্ব এত বৈজ্ঞানিক, তোমার এই সংহারলীলা এত স্বাস্থ্য-নিয়ম-সঙ্গত যে Conic Section সম্বন্ধে যেমন আমার কোন আগ্রহ নেই, তোমার এই সবেও তেমন আস্থা নেই। তোমার এই হত্যাকাণ্ডগুলি বেশ মাপ-জোক করা বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রামাণ্য, কাজেই যদি কোনদিন এ কাণ্ড সম্ভব হয় তবে St. Bartholomew বা Russian pogroms-এর চেয়ে তা খুব পৈশাচিক ও নিষ্ঠুর হবে সন্দেহ নেই। তাছাড়া ও-সবের মধ্যে ধর্ম্মের বা ধর্ম্মাচারের সামান্য আভাস থাকাতে লোকে তা হয়ত ক্ষমা করতে পেরেছে, আর তোমাদের?

আমার মন্তব্য শুনে সে বল্লে—ক্রীতদাসের মত কথা বলছ। ইংরেজ যে আমাদের জয় করেছে তা নয়, তারা আমাদের এই বলে

শাসাচ্ছে যে বিদ্রোহ মাত্রেই পাপ, একটা ধ্বংস-মূলক অনাচার। সারা ভারতবর্ষের পবিত্র তীর্থের বুক চিরে, হিমালয়ের গা চিরে তৈরী তাদের ধর্ম্মহীন রেল পথগুলো তুমি যদি দেখতে তবে মনে হ'ত যেন মহারাক্ষস তার বড় বড় দাড়া তোমার বুকের মধ্যে ফুটিয়ে তোমার সমস্ত জীবন-রস শুষে নিচ্ছে! কোনদিন যদি এসব কল্পনা করতে পারতে, স্পষ্ট উপলব্ধি করতে, তবে এখানে বসে বসে বোকার মত কথার মালা গাঁথতে না।

এমনি করে পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্পের প্রভাব যে এশিয়ার পক্ষে খুবই মারাত্মক সে কথা সত্য বলে স্বীকার করে বললুম—এ বস্তু যে এশিয়ার জীবন-রস শুষে নিচ্ছে তা জানি কিন্তু সে ঝগড়া তো তাহলে ইংরেজের সঙ্গে নয়, পাশ্চাত্য মহাজনী ব্যবস্থার সঙ্গেই হওয়া উচিত।

সে মাথা নেড়ে বল্লে—না, যদি আমাদের নিজের দেশের লোক দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ করত আর যদি আমাদের নৌ-বল ও সৈন্য-বল থাকত, তবে সমস্ত টাকাটা দেশেই খরচ হ'ত এবং দেশেই থেকে যেতো। ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারীদের মাইনে দিতে বিদেশে টাকা পাঠাতে হ'ত না। একবার ভাবো দেখি! যদি সমস্ত লাভের অংশ ভারতে ভারতবাসীর মধ্যে ভাগ কোরে দেওয়া হ'ত তাহলে দেশের অবস্থা আজ কত সমৃদ্ধ হতে পারত!

সুতরাং সে চায় ন্যাশানালিজম দিয়ে ইম্পিরিয়ালিজম জয় করতে অথচ দুটোই সমান অসম্পূর্ণ ও পরস্বলোলুপ। সে-কথা আমি তাকে জানিয়ে বল্লুম—কিন্তু দেখ, তোমার কথাগুলোর এ-রকম একটা ব্যাখ্যা দিতে আমার ইচ্ছে নেই।

সে বল্লে—আমার কথা তুমি যে অর্থেই নাও তাতে আমার কিছু এসে যায় না! তোমার ধ্যান-ধারণায় পাশ্চাত্য কালিমার ছাপ পড়েছে

তাই তুমি তাদের দিক থেকে আমাদের বিচার করছ—তুমি একটা দাস বনে গেছ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা, দুটো শ্রেণী হিসাবে ব্যাপারটাকে দেখছ না কেন? জগতে মাত্র দু'দল আছে, এক দল যারা সঞ্চয় করে সম্পন্ন হয়েছে, আর এক দল যারা সব থেকে বঞ্চিত। বিশ্বজুড়ে এই যে সংঘাত জেগেছে সে হচ্ছে এই দুই পরস্পর-বিরোধী দলে যুদ্ধযাত্রা, অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হয়। ইম্পিরিয়ালিজম আর ন্যাশানালিজমের মধ্যে আমি ত বিশেষ কোনো তফাৎ দেখি না। আমার এই কথায় তার মন্তব্য হ'ল যে আমি আত্মাহীন সোশিয়ালিষ্টদের মত কথা বলি।

আমি অস্বীকার করলুম—আমি সোশিয়ালিষ্ট নই—তাদেদ মতবাদ আমি ঘৃণার চোখে দেখি। পুরানো প্রভুত্বের বদলে সোশিয়ালিষ্টরা একটা নূতন জবরদস্তি খাড়া করতে চায় আর আমি চাই মানুষের মনে একটা স্বাধীনতা বোধ জাগিয়ে তুলতে—কারণ সেই পথেই হবে কল্যাণ।

সে রেগে উঠল—মনের কথা বলতে লজ্জা করে না, অনাহারে এদিকে দেহ যে মরবার দাখিল, তার কি? অন্নাভাবে যে-মানুষ মরছে তার কাছে দর্শনের আলোচনা করে তাকে কোন্ সাহসে অপমান করতে চাও শুনি?

আমি সে-কথা স্বীকার করে বল্লুম—হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলেছ, কিন্তু দেহ যেদিন অন্ন-পুষ্ট হবে সেদিন আত্মার আলোচনা তো অবান্তর নয়। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের মতে এইটাই ছিল সব চেয়ে প্রধান জিনিস?

আমার কথা শুনে সে ক্রমাগতই চটে যাচ্ছিল, এবার ব্যঙ্গের সুরে বল্লে—তোমার পূর্ব্ব-পুরুষদের সম্বন্ধে কি জানো বল ত?

বিরোধ মেটাবার জন্য আমি অন্য পথ ধরলুম, তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা, বল ত, কেমন করে আমি দেশের সেবা করতে পারি?

সে বিরক্ত হয়ে বল্লে—মুখ বুজে থেকে।

যাই হোক, ভারতীয় ন্যাশানালিজম সম্বন্ধে নানা বিভিন্ন রকমের মতামতের পরিচয় পেলুম।

সব চেয়ে একজনের কথা আমার মনকে বিশেষ করেই স্পর্শ করেছিল। সে ছেলেটির নাম দিলুম নন্দ।

নন্দ তখন সবে দেশ ছেড়ে এসেছে। একদিন তাকে বল্লুম, দেখ, আমি এদেশে আজ প্রায় তিন বছর রয়েছি এবং আমার খুবই মনে হয় যে প্রতীচ্য সভ্যতার কাছে আমাদের নূতন করে শেখবার কিছু নেই। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের ধ্যান-ধারণার মধ্যে আবার ফিরে যাওয়া। এ পৃথিবী যে ঠিক চলছে, কোথাও কোন দোষ হয়নি এ বিশ্বাস তাঁদের ছিল। পৃথিবীতে দোষ যদি কোথাও থাকে তবে তা আমাদের মধ্যেই প্রথমে ঘটেছে। সুতরাং আমাদের যত চিত্তশুদ্ধি হবে, আমরা যতই ধর্ম্মাশ্রিত হব, বিশ্বের সমস্ত সমস্যা ততই লোপ পাবে। আমাদের দেব-কল্প হতে হবে। তখন আমাদের কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকবে না; কারণ নিজেদের মনের ভিতরকার অভাব-বোধটা তখন আমরা জয় করতে পারব। যদি আত্মার শক্তিতে সব ক্ষুধা দমন করতে পারি তখন কোন কিছুর জন্য বা কোন কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে না। নিজেদের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন সাধন করে আমরা সমস্ত বিশ্বকে স্বতঃই বদল করতে পারব। তোমার মনে আছে বুদ্ধদেব যখন গণিকার বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে গেলেন তখন তা পবিত্র হয়ে গেল, কেবল তাঁর মত মহাত্মার আধ্যাত্মিক প্রভাবে। তাই আমার মনে হয় যে আমাদের পথ কলেজের দিকে যায়নি, তার গতি

আত্মার দিকে—বুঝলে নন্দ—এ ব্যাপারে আমাদের দেশ প্রতীচ্যকে অনেক কথা শেখাতে পারে।

এতক্ষণ চুপ করে আমার কথা শুনে নন্দ উত্তর দিলে—আমি স্বীকার করছি যে আমাদের যে আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে তা পার্থিব সম্পদের চেয়ে খুব প্রয়োজনীয়। কিন্তু ভারতের মাটির নীচে যে পার্থিব প্রাকৃতিক সম্পদ সঞ্চিত আছে এবং মাটির উপরে সস্তায় যে মজুর পাওয়া যায় এই দুই জিনিসের আকর্ষণে পাশ্চাত্যরা সব আত্মসাৎ করবার মতলবে দেশের বুক জুড়ে বসেছে। পাশ্চাত্য দেশের যত মূলধনী মহাজন এই দুই কারণে ভারতে এসে শুধু যে সে দেশের অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশ করছেন তা নয়, তাঁদের তথাকথিত সভ্যতার মারাত্মক আওতায় গৃহশিল্পের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধের এতদিনের বাঁধনও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আগে চাষারা নিজের জমিতে আট ঘণ্টা কাজ করত, আজ তারা পরের কারখানায় বারো ঘণ্টা ভূতের ব্যাগার খেটে মরছে। মাঠে লাঙ্গল ঠেলতে ঠেলতে যে চাষা মনের আনন্দে গান ধরত, আজ সে কারখানার কাজে বিরক্তিতে ইতর ভাষায় জঘন্য গালাগালির কাদা ছড়ায়।

আমি বল্লুম—প্রতীচ্যের আমদানী এই শ্রম-শিল্পের প্রভাব থেকে প্রাচ্যকে মুক্ত করতে হলে আগে আমাদের নিজের বশে আনা দরকার। পশ্চিমের আমদানি এই যূথ-বদ্ধ লোলুপতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত হতে হলে আমাদের নিজেদের সমস্ত লোভ বর্জ্জন করতে হবে। এমনি করে নিজেদের থেকে আমাদের প্রথমে মুক্ত করতে পারলে পশ্চিমের কবল থেকে এশিয়াকে বাঁচান কঠিন হবে না, আমার মনে হয় তা আপনা-আপনিই হয়ে যাবে।

নন্দ বল্লে—হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন অগাধ, ধন-সম্পত্তিও তেমনি অতুল, আর এর পিছনে রয়েছে মনো-

রাজ্যের আধ্যাত্মিক বিভব। প্রতীচ্য সভ্যতা যদি কোনদিন এই বিভবের সন্ধান পেত! কেমন করে তাদের এই সম্পদের ভাগ দেব, সেইটেই তো সমস্যা। যদি পশ্চিমে গিয়ে বলি—আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে প্রচুর, তোমাদের কিছু দিতে চাই, তখন সে বলবে, 'তোমরা আবার আধ্যাত্মিক হলে কেমন করে, তোমরা যে পরাধীন? সব জিনিস যাদের করায়ত্ত, যাদের নিজের একটা অর্থনৈতিক পদ্ধতি আছে, জগতে এমন জাতই সত্যই আধ্যাত্মিক সম্পদের মালিক।' তুমিই বল, তাদের এ প্রশ্নের আমরা কি জবাব দেব?

আমি বল্লুম—আমি জানি না, তুমি কি বল?

নন্দ বলতে লাগল—যতদিন না আমরা গায়ের জোরে পাশ্চাত্যের অধীনতা থেকে দেশকে স্বাধীন করছি ততদিন তারা প্রাচ্যের এ আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করবে না, সে সম্পদ আছে বলে স্বীকার করবে না। য়ুরোপের আধুনিক বর্ব্বরতাকে ভারতের এই আধ্যাত্মিকতা দান করতে হলে তাদের নিজের অস্ত্রে তাদের জব্দ করতে হবে। ন্যাশানালিজম ও ন্যাশানালিটি জিনিস যাই হোক, বর্ত্তমান সভ্যতায় ও-গুলো এক একটা ধাপ এবং আমাদেরও এই পথে উঠতে হবে। যতদিন না ভারত সমস্ত বিদেশী প্রভাব ও আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতায় গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে ততদিন ধনশক্তি-গর্ব্বিত কোন প্রতীচ্য দেশ আমাদের আধ্যাত্মিক কথায় কান দেবে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নন্দর কথাগুলো ভাবতে ভাবতে জেরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। নন্দ যা বলছিল তা আমার মনে খুবই লেগেছিল। নিজের আধ্যাত্মিক সম্পদ দান করবার জন্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গুণ্ডামি রপ্ত করতে বসবে? সত্যই কি এর কোন প্রয়োজন আছে?

এই সময়ে সানফ্রানসিসকো থেকে ফ্র্যাঙ্ক তার সোশিয়ালিষ্ট সাপ্তাহিকখানি সম্পাদন করছিল এবং জেরী ও লিও তার কাছে গিয়ে জুটেছিল। ফ্র্যাঙ্ক এখন দাড়ী কামিয়ে ফেলেছে আর আমায় অর্থ সাহায্যের দায় থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের ও বন্ধুদের নতুন স্থট কিনে বেশ একটু ভদ্র হয়েছে। আমি যখন গেলুম তখন সবাই একসঙ্গে বসে গল্প করছিল।

হঠাৎ ফ্র্যাঙ্ক আমায় বল্লে—আচ্ছা, তুমি এই স্থটটা কতদিন ধরে পরছ বল ত?

আমি বল্লুম—ছ'বছর।

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—বেশ, এ সপ্তাহের মাইনে পেলে তোমায় একটা নতুন পোশাক কিনে দেব।

লিও তাতে আপত্তি করলে—সে জেদ করতে লাগল যে শুভস্য শীঘ্রম্।

সে বল্লে—এখন তারা ধারে জিনিস ছেড়ে দিতে পারে, তুমি মাইনে পেলে ধার শোধ কোরো—ঐ স্থটটা পরে ওকে শয়তানের মত দেখাচ্ছে, আর স্থটটি যেন ভারতের জাতীয় পতাকা—যত দূর থেকেই হোক একে আমি ঠিক চিনতে পারি!

অতএব সকলে মিলে দরজীর দোকানে অভিযান করলুম এবং একটি তৈরী পোশাক কিনে পরে নিলুম। প্রায় বছর তিনেকের মধ্যে এই আমি প্রথম নতুন পোশাক পরলুম। নব পরিচ্ছদে আমি এত গর্ব্বিত হয়ে উঠলুম যে লোকেরা আমার দিকে চেয়ে দেখছে না বলে মনে আঘাত লাগল। পুরানো পোশাকটা পরে যখন পথে বার হতুম তখন তারা ত সব সময় আমার দিকে চেয়ে থাকত!

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা একটা সস্তা হোটেলে আশ্রয় নিলুম এবং দর্শনের-আলোচনা আরম্ভ হ'ল। নন্দর সঙ্গে আমার যেসব কথা হয়েছিল তা জেরীকে বল্লুম।

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—নন্দ ছেলেটি নিশ্চয় খুব বুদ্ধিমান, কি বল ?

লিও বল্লে—আমার এসব ভাল লাগে না। পাশ্চাত্য intellectualismকে দাবিয়ে দেবার জন্যে ভারতের এই সব বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকেরা নিজেদের একটা প্রতিদ্বন্দ্বী intellectualism সৃজন করছে। আমি বেশ কল্পনা করতে পারি যে গ্লাডষ্টোন বা লর্ড সলসবেরী খুব গম্ভীরভাবে বলছেন যে আমাদের জাতীয় আধ্যাত্মিকতার কল্যাণ বিতরণের জন্য আমরা পৃথিবী জয় করতে বাধ্য হয়েছি। তার শেকসপীয়ার, তার নৈতিক সম্পদ, তার আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠার অংশ দেবার জন্যই ইংলণ্ড বহু অনাকাঙ্খিত রাজ্য জয়ে বাধ্য হয়েছে। তাদের আধ্যাত্মিক সম্পদে ভাগ দেবার জন্য আমাদের আগে জয় করতে হবে এসব কথা ভারতীয়দের মুখে শোভা পায় না। তাদের কাছে নূতন কথার আশা রাখি।

অকস্মাৎ আমার দিকে ফিরে লিও বল্লে—আচ্ছা, তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে পাশ্চাত্য শাসক-সম্প্রদায় ভারতবর্ষকে মনের দিক থেকেও ক্রমে ক্রমে জয় করছে ? তোমরা তাদের ভাবেই ভাবো ও কথা বল নাকি ?

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—তা সত্যি, কিন্তু আমার মনে হয় এ-সবের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। তুমি ইহুদীদের ইতিহাস জানো। ইহুদীরাও প্রাচীর লোক। তাদের শাস্ত্র-পুরাণ যদি আমার ঠিক স্মরণ থাকে তাহলে বলি যে তাদের জীবনে তাদের সব চেয়ে বড় বড় ব্যাপারগুলো ঘটেছিল যখন তারা হয় বন্দীত্ব বা নির্ব্বাসন-লাঞ্ছনা ভোগ করছে। যখনই তারা অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়েছে, তখনই তাদের মধ্যে প্রফেট (prophet) এসেছেন এবং যখন তাদের সব চেয়ে বড় ধর্ম্মগুরুর আবির্ভাব হ'ল সে সময় তারা রোমের শাসনের ভারে নিপীড়িত। এর মধ্যে একটা ভারী অদ্ভুত ব্যাপার আছে। লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করলে তারা রোম সম্রাটকে (Cæsar) কর দেবে কিনা, তখন যীশু বল্লেন—সীজারের

প্রাপ্য সীজারকে দিয়ে দাও। এই কথায় তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, সামান্য মাত্র বস্তু দিয়ে, সোনা-রূপো দিয়ে, রোমকে বা শাসকদের খুশী করা সহজ, আর তাতেই বা কি আসে যায়! ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধই ত সব চেয়ে মূল্যবান আর প্রধান জিনিস।

ফ্র্যাঙ্ক বলতে লাগল—এখন আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে ভারতবাসীদের এই দিক থেকে দেখা উচিত। নিজেদের তৈরী বস্তু-তান্ত্রিকতা দিয়ে পাশ্চাত্যের বস্তু-তান্ত্রিকতা দমন করবার চেষ্টা তাদের না করাই ভাল। ভারতবাসী প্রাচ্যের লোক এবং যীশুর মতই প্রতীচ্যকে তার বলা উচিত—তুমি ত কেবল বস্তুর দাবি নিয়ে ঘুরছ, কিন্তু আমার আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আমি এত ব্যস্ত যে তোমার দিকে মনোযোগ দেবার আমার সময় নেই। পরাধীন হয়েছে বলে কারুর লজ্জিত হবার বিশেষ কারণ নেই। ভারতীয় ব্যাপারে যারা নিজেদের কেবলই নীচু করছে তারা হ'ল শাসক সম্প্রদায়। স্বাধীনতার নামে তারা একটা জাতির সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করে নিজেদের আত্মার অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করছে। বারনারী যেমন করে তার দেহ বেচে, এরা তেমনি করে স্বাধীনতার ফেরি করছে। অথচ ভারতবাসীদের ত খুব বেশী কিছু খোয়া যাচ্ছে না। তাই, যদি জেতা ও বিজিতের মধ্যে আমায় বেছে নিতে বল তবে আমি 'হারমানাদের' দলে। তাতে অন্ততঃ তোমার আত্মা কোথাও ক্ষুণ্ণ হবে না। যীশু যেমন করে রোমানদের দিয়েছিলেন, যদি পারো তবে তেমনি করে ইংরেজকে তোমার আধ্যাত্মিকতার অংশ দাও। তোমরা বিজিত বলেই আজও তোমাদের আধ্যাত্মিকতা অটুট আছে, তোমরা বিজিত না হলে এতদিন তোমরা আধ্যাত্মিকও থাকতে না।

ফ্র্যাঙ্কের এই দীর্ঘ মন্তব্য শেষ হতে আমি জেরীর দিকে চাইলুম। আমি জানতুম যে জেরী ফ্র্যাঙ্কের মত এমন সঙ্গতি রেখে ধারাবাহিক-

ভাবে চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু তার এমন একটা মন ছিল যা বিত্যুতের মত আকাশের বুক চিরে আপন দীপ্তিতে প্রকাশিত হ'ত।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জেরী বল্লে—তোমাদের এ সমস্তই বাজে কথা। তোমাদের দেশ স্বাধীন হতে পারে কিন্তু তাতে বোঝায় না তোমাদের আত্মাও স্বাধীন। এই সব তথাকথিত স্বাধীন দেশে লোককে ভোটের অধিকার দেওয়া অন্ধের হাতে লণ্ঠন দেওয়ার সামিল— কি কাজে লাগবে শুনি? এ পৃথিবীতে আমরা এসেছি আমাদের এই অন্ধতা দূর করে আলো দেখব বলে। আর এই নির্ব্বোধের দল একটা ভোট দিয়ে এই জমাট অন্ধতার একটা বিশ্রী প্রহসন বানাতে চায়। আরে, অন্ধের হাতে আলো যেমন তাকে পথ দেখায় না, ভোটারের ভোটও তেমনি মুক্তির পথের সন্ধান দেয় না। অন্ধের সঙ্গে যতই অন্ধকে বেঁধে জড়ো কর, তা দিয়ে আলোর দেখা পাবে কি! তোমার এই সব ভারতীয় লোকদের পাণ্ডিত্য খুবই চমৎকার এবং হয়ত তার দামও আছে, কিন্তু পাণ্ডিত্য সব সময়ে তরুণদের পথ ভোলায় আর তরুণরা তো ভুলতেই চায়।

লিও বল্লে—আর বুড়োরা কি করে জেরী?

জেরী বল্লে—বুড়োরা যুবাদের ফাঁকি দিয়ে খায়। পুরুষরা কাজ করে, কিন্তু মেয়েরা কাজও করে আবার সেই সঙ্গে খরচও করে। তাই দেখি প্রত্যেক মূর্খতার মধ্যে ক্রূর পরিহাস লুকিয়ে আছে আর সেই পরিহাসের মধ্যে থেকে নব নব মূর্খতা জেগে ওঠে। এই যে সমুজ্জ্বল বিরাট অন্ধকার যাকে আমরা বিশ্ব বলে গর্ব্ব করি এ তারই বর্ণনা।

আমি বল্লুম—কিন্তু, জেরী, এ সবের উত্তর কি বল?

জেরী বল্লে—এর উত্তর কোথাও না কোথাও আছে, তোমার দেশের প্রাচীন ঋষিদের মত যখন কেউ তার সন্ধান পায় তখন বুঝতে পারে যে মানুষের ভাষার মত সামান্য আধারে সে বিরাট সত্য ধরা যায় না।"

এই সময় একবার সোশিয়ালিস্টদের সভায় গিয়ে পুলিশের হাতে খুব লাঞ্ছিত হয়েছিলুম। ক্যালিফোরনিয়ার প্রধান প্রধান শহরে তাদের দল পুষ্ট হচ্ছে দেখে বোধ হয় পুলিশ ক্ষেপে গিয়েছিল, তাছাড়া অন্য কোন কারণ ত আমার মনে পড়ছে না। অবশ্য আমরা সোশিয়ালিস্টদের দলভুক্ত ছিলুম না এবং সত্য বলতে কি অন্য লোকে কেন যে থাকে তা আজও বুঝতে পারলুম না।

শহরে সোশিয়ালিস্ট দলপতিদের মধ্যে ছিল জোনস্ (Jones) বলে একজন অন্ধ। লোকটি খুবই চিন্তাশীল ছিল কিন্তু অন্ধ বলে বেশী লোকের সঙ্গে মিশতে পারত না, আর বাইরে ত যেতেই পারত না। তার স্ত্রীটি ছিল ভারি চমৎকার, কিন্তু 'মহাজনীর ব্যবস্থা'র অহোরাত্র আলোচনায় সে তাকে জ্বালাতন করে তুলেছিল। সে যেন ভাবত যে, কোন জিনিসের সঙ্গে মহাজনী ব্যবস্থার মূলগত যোগ খুঁজে বার করতে পারলেই তার দোষ খণ্ডান যায়। সুতরাং ন্যাশানালিজম, মিলিটারীজম, এনার্কিজম, যে ব্যাপারই হোক না কেন সে তা তন্ন তন্ন করে খুঁজে আর চুল-চেরা বিচার করে মহাজনী ব্যবস্থার সঙ্গে তার যোগসূত্র বার করত, তারপর মিষ্টি হেসে বলত—এখন তোমার কাজ হচ্ছে এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন।

এই লোকটির মনে ছিল বিপ্লবের এক স্বপ্ন, কারণ তার ধারণা ছিল যে গোলযোগ শীগগির বাধবেই, অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে সে প্রত্যক্ষ হাঙ্গামার পক্ষপাতী ছিল না। বস্তুত সে শুধু চাইত প্রাধান্য ও প্রভুত্ব। সোশিয়ালিস্টদের সঙ্গে ক্যাপিট্যালিস্টদের যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই সে-কথা সর্ব্বপ্রথমে বুঝি এই লোকটির কথা-বার্ত্তায় ও ব্যবহারে। প্রত্যেকেই তার শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে চায়, প্রত্যেকেই তার নিজের

সত্য প্রচার করতে চায়, প্রত্যেকেই তার প্রভুত্ব ফলাতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক মানুষেরই এই লক্ষ্য, তা সে যে দলেরই হোক না কেন! তাই অন্ধ জোনসের কথার মধ্যে এই আত্মম্ভরিতার সুর আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার দু'চোখ বন্ধ থাকলেও চোখ থেকেও যারা দেখে না জোনস তাদেরই মত দৃষ্টিহীন।

তার চেলাদের দিয়ে জোনস একটা প্রতিবাদ সভার ব্যবস্থা করেছিল। এ সভার কাজ ছিল দুটি—এক হচ্ছে রাস্তার মোড়ে সোশিয়ালিস্ট-প্রচারকদের বক্তৃতা বন্ধের প্রতিবাদ, আর অপরটি হচ্ছে জোনসকে দলের মধ্যে কোন বড় পদে প্রতিষ্ঠিত করা, অবশ্য পদটি যে কি তা আমি কোনদিনই বুঝতে পারিনি।

স্ত্রীলোক ও পুরুষে প্রায় সাতটার সময় সভাগৃহ ভর্ত্তি হয়ে গেল। সভায় প্রস্তাব উঠল যে জোনস সভাপতি হবে এবং সে তা হ'ল। একটা বিরাট বক্তৃতার পর অন্ধ জোনস সভার কার্য্য আরম্ভ করবার সম্মতি দিলে। বিস্তর লোক উঠে বিস্তর কথা বল্লে এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন সভাপতির সম্বন্ধে অনেক ভাল কথাই শুনালে।

তারপর হঠাৎ জেরী দাঁড়িয়ে উঠে সবাইকে বল্লে—সমবেত ভদ্র-মহিলা ও মহোদয়গণ, জোনসকে যারা এই পদে প্রতিষ্ঠিত করেছে তারা কারা? Nietzsche (নিট্‌জে) এর অতি-মানুষের (Ubermensch) উপর আমাদের সবায়েরই শ্রদ্ধা আছে। প্রকৃতির অতি-মানুষের শাসন আমরা মেনে নিতে রাজী আছি, কিন্তু কি লজ্জার কথা যে আজ জোনসের অধম চেলারা আমাদের উপর প্রভুত্ব করতে চাইছে। ভিতরে ভিতরে মতলব করে এই সভা আহ্বান করে জোনসকে তারা সভাপতির আসন দেয় কোন অধিকারে?

এসব শুনে সকলে চেঁচিয়ে উঠল—চুপ, চুপ। তুমি এনার্কিষ্ট, তুমি এ-দলের নও।

কাজেই জেরী বসে পড়ল।

তারপর আর একজন লোক উঠে বক্তৃতা দিলে; সে বল্লে যে যারা সোশিয়ালিষ্ট তারাই এনার্কিষ্ট, পরস্পরের মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। এতদিন নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে যদি উভয় দলের শত্রু মহাজনী-ব্যবস্থার সঙ্গে তারা লড়াই দিত তবে দশ দিনের মধ্যে পৃথিবী ভাল হয়ে যেত।

জেরী চীৎকার করে উঠল—একজন সোশিয়ালিস্টের জন্যও পৃথিবীর আমি ভাল করব না, আমি বরং আরও খারাপ করে দিতে চাই।

একজন চেঁচিয়ে উঠল—ওকে বার করে দাও ত।

সভায় আমাদের প্রস্তাবটা কেউ তুলবেন কি? এই প্রশ্ন হতেই সভায় প্রস্তাব করা হ'ল যে—শহরের শাসক সম্প্রদায় সোশিয়ালিস্টদের সমাজচ্যুত দলের মত ব্যবহার ক'রছেন। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা গুরুতরভাবে প্রতিবাদ করি। এ প্রস্তাব সভায় গৃহীত হ'ল।

সবে মাত্র প্রস্তাবটি স্বীকৃত হয়েছে এমন সময় ঘরের শেষ দিক থেকে একটা ভয়ানক আর্ত্তনাদ উঠল এবং গোয়ালে আগুন লাগলে যেমন করে গরুরা ছোটাছুটি করে, লোকগুলো তেমনি হুড়োহুড়ি করতে লাগল। পুলিশের লাঠি উঠছিল আর পড়ছিল ঢেঁকির মত, আর স্ত্রী-পুরুষ সবাই দৌড়ে দৌড়ে চেয়ার টেবিলের তলায় লুকোচ্ছিল। ডেইসের (dais) উপরে জোনস বসেছিল—সে অন্ধ বলে শুধু শুনতেই পাচ্ছিল, কি যে হচ্ছিল, দেখবার উপায় ছিল না।

আমার পাশেই একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল আর তার পাশেই ছিল ফ্রাঙ্ক। হঠাৎ দেখি কোথা থেকে মেয়েটির মাথার উপর এক লাঠি উঠেছে—আমি সেটা আটকাবার জন্যে হাত উঠালুম, আর ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে একপাশে সরিয়ে দিলে; এই অবসরে লাঠিটি এসে পড়ল ফ্যাঙ্কের মাথায়। তারপরেই আমার ঘাড়ের উপর খুব

ব্যথা বোধ হ'ল এবং সে ব্যথা আর বার দুই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগৎ আমার চোখে মনোরম অন্ধকারে ভরে গেল। কিন্তু তখনও আমি দেখলুম যে বিস্তর লাঠি পড়ছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে জোনসের মাথায় একটা লাঠি নেমেছিল কিন্তু সেটা পড়বার আগেই কে তাকে সরিয়ে দিলে। এইবার ভয়ানক অন্ধকারে আমি আচ্ছন্ন হয়ে গেলুম এবং শান্তির অতল গহ্বরে আমি যেন তলিয়ে গেলুম।

জেগে উঠবার পর ঘরটা অচেনা ঠেকল বটে, কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের চেনা গলার আওয়াজে আশ্বস্ত হলুম। সে বল্লে—তুমি কি জেগেছ?

হ্যাঁ, কি হয়েছিল বল ত?

তোমার মনে পড়েছে নাকি? এখনি সব কথাই মনে পড়বে, থামো না!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কেউ মারা পড়ে নি তো?

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—না, ওরা তো মেরে ফেলে না, খালি জখম করে দেয়।

আমি বল্লুম—তুমি কেমন আছ?

সে বল্লে—মাথাটা আবার ভেঙ্গেছে, কিন্তু সেই গর্ভবতী স্ত্রীলোকটিকে মারের হাত থেকে বাঁচানো গেছে।

তোমার মাথার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, ফ্র্যাঙ্ক।

পরের দিন যখন জেরীর সঙ্গে দেখা হ'ল, দেখি তার হাতে এক ভাঙ্গা লাঠি। সে বল্লে—এই লাঠিটা একটা পুলিশম্যানের মাথায় ভেঙ্গেছি। সে আমায় ভারি বিশ্রী জায়গায় মেরেছিল, কিন্তু আমি তার জারিজুরি একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছি—এই লাঠির একটি ঘায়ে সে একেবারে জমি নিলে।

ফ্যাঙ্ক বল্লে—লিওর খবর কি?

জেরী বল্লে—লিও হাসপাতালে। তারা তার হাত ভেঙ্গে দিয়েছে, তবে সে কাল সেরে উঠবে। কিন্তু এই পুলিশের লাঠি খাওয়া ভারি

একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। এসব দূর করে ফেলে দিয়ে, এবার নতুন কিছুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ব।

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—তুমি কি চাও বল ত? এবার কি বৈচিত্র্যের সন্ধানে প্যালেস হোটেলে গিয়ে থাকবে নাকি?

কেমন কবে মারামারি স্থরু হ'ল সে-কথা জেরীকে জিজ্ঞাসা করলুম।

সে বল্লে—হাঁদা সোশিয়ালিস্টগুলো পিছনের দরজা বন্ধ করে রাখেনি, আর সামনে দিয়ে বেরোবার কোন পথ নেই। কাজেই দরজা দিয়ে ভ্রূদল ঢুকে পড়ল, লোকগুলো আর করে কি, মাথা বাঁচাবার জন্ম চেয়ার ছুড়তে স্থরু করলে। পাশ থেকে আক্রমণ করলে মানুষ আর কেমন করে বুঝবে বল? অবশ্য এতে বিশেষ কিছু এসে গেল না, সবাই নির্ব্বিবাদে পড়ে পড়ে মার খেলে। তাছাড়া এতে সোশিয়ালিস্টদের খুব একটা বাছাই হয়ে গেল! যাকগে, আমরা চাই রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করতে, আমরা চাই চার্চ্চ ধ্বংস করতে, আমরা চাই সমাজ লোপ করতে, কারণ যেখানে কিছুই থাকে না সেখানে ঈশ্বর আছেন।

আমিও মনে মনে এই প্রার্থনা আবৃত্তি করে ঘুমিয়ে পড়লুম!

সে বছরের বাকী দু'মাস একঘেয়ে জীবনের একটানা স্রোত অবাধে বয়ে গেল এবং যেই ছুটি হ'ল আমিও বাইরের কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। এবার গাঁয়ের মধ্যে হিন্দু মজুরদের সঙ্গে কাজ করতে গেলুম। এরা খুব খাটতে পারে, আর যথাসম্ভব তরি-তরকারী খেয়ে থাকে। এদের জীবনযাত্রা খুবই সাদাসিদে বলে আমেরিকানরা হিন্দুদের আসার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। কারণ এখানে ভারতবাসী মজুররা কম মজুরীতে সব কাজ নিয়ে নিচ্ছে।

প্রথমে আমি কাজ নিলুম এ্যাসপ্যারাগাসের (Asparagus) ক্ষেতে। সে এক চমৎকার ব্যাপার। আমরা রাত সাড়ে তিনটে

সময় উঠতুম আর দিনের আলো ফোটবার আগেই কাজে নামতুম। আমরা কাজ-হিসাবে দাম পেতুম। এক ঝুড়ি বোঝাই করতে পারলে দশ সেণ্ট পাওয়া যেত। মাইলের পর মাইল লম্বা এ্যাসপ্যারাগাসের ক্ষেতে আমাদের কাজ করতে হ'ত। ছুরি নিয়ে নীচু হয়ে একটা ডাঁটা কেটে ঝুড়িতে ফেল্লুম আবার সামনে আর একটা ডাঁটা জেগে উঠল। আবার নীচু হয়ে সেটা কাটলুম; এইভাবে ক্রমাগত নীচু হওয়া, কাটা আর কুড়িয়ে ঝুড়িতে ফেলায় আমাদের ভয়ঙ্কর পরিশ্রম হোত। কেবল চল আর নীচু হও, নীচু হও আর চল—রাত সাড়ে চারটে থেকে সুরু হয়ে সন্ধ্যা প্রায় সাতটা পর্য্যন্ত এই চলত।

এই লোকগুলোর কাজ করবার ঝোঁক দেখে আমার ভয়ানক বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। এরা এতক্ষণ খাটত যে অন্য কোন মজুর তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, কাজেই মার্কিন কর্ম্মী-সঙ্ঘ-ভুক্ত মজুররা যে এদের দেশছাড়া করতে চাইবে তার আর আশ্চর্য্য কি? তাদের নিজেদের জায়গায় এরা মার্কিন মজুরের দাম কমিয়ে দিচ্ছিল।

এই এ্যাসপ্যারাগাস ক্ষেতে মাঝে মাঝে আমাদের উপরওয়ালার আবির্ভাব হ'ত; জলদি করো, জলদি করো, এই ছিল তার বুলি। মানুষ-রূপী জানোয়ারের দলকে আরও কাজে লাগাবার, আরও পরিশ্রম করবার এই ছিল তার মন্ত্র। কখনও কখনও কর্ম্মিকেরা এত ক্লান্ত হয়ে যেত যে, সব ভোলবার জন্য তারা মদ আনিয়ে খেতো! দেশে থাকতে এদের মধ্যে এত সব অনাচার ছিল না। কিন্তু এ-রকম কাজের মধ্যে মাস ছয়েক কাজ করে তাদের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, তারা বেঁচে আছে এই কথা ভোলবার জন্য তারা মদ খেয়ে খেয়ে সারাদিনের মজুরী উড়িয়ে দেয়। এই অমানুষ নির্দ্দয় কাজে কয়েক মাসের মধ্যে তাদের চরিত্রের ভারতীয় বিশিষ্টতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

এইখানে একটি হিন্দু মেয়ে ছিল। সে স্বামীকে ছেড়ে অপর একটি লোককে ভালবাসতো। ক্রমে এই দুজনের মধ্যে এমন মর্ম্মান্তিক শত্রুতা জেগে উঠল যে পরস্পরকে তারা খুন করতে পারলে খুশী হয়। এই প্রথম দেখলুম যে বিষম কাজের চাপে হিন্দুনারীর নৈতিক বোধ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু প্রাণহীন এই কাজের মধ্যে তার মনও মুমূর্ষু হয়ে এসেছিল।

একদিন তার স্বামী যখন মাঠে কাজ করছে এমন সময় খবর এল যে তার স্ত্রী অপর লোকটির সঙ্গে পালিয়ে গেছে। পরের দিন তার স্বামীও চলে গেল এবং সপ্তাহখানেক পরে অবাধ্য স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। সে তাকে বিষম প্রহার দিয়েছিল। এবার সে তার স্ত্রীর প্রেমিকের ঘাড় মটকাবার চেষ্টা করতে লাগল। এর ফলে স্ত্রী গিয়ে স্বামীর নামে মার্কিন আদালতে নালিশ করলে এবং স্বামীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর ব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হ'ল। স্বামীর জেল হয়ে গেল। এতদিন সে বস্তু-জগতের মধ্যেই ছিল; চিত্তলোকের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই ছিল না, তাই আশ্রয়ের অভাবে সে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পেতে লাগল।

তার সঙ্গে একবার জেলে দেখা করতে গেলুম। সে বল্লে—সবুজ ঘাস দেখতে পাই না, সূর্য্যের আলো চোখে পড়ে না, সব লোপ পেয়েছে। হা ভগবান, যদি নিজেকে মেরে ফেলতে পারতুম! আর ত এসব সহ্য করতে পারি না।

ভগবান যেন তার প্রার্থনা শুনেছিলেন। এক বছরের মধ্যেই সে যক্ষ্মা রোগে মারা গেল। তার স্ত্রী যখন এ খবরটা পেলে, সে তার মনের মানুষকে ছেড়ে চলে গেল। শুনলুম সে নাকি ভারতবর্ষে ফিরে যাবে বলে জাহাজে উঠেছিল কিন্তু বাড়ী পৌছতে পারেনি, এক চীনা বন্দরে সে আত্মহত্যা করেছে।

১৬

কিছুদিন পরে এসপ্যারাগাসের ক্ষেত ছেড়ে সেলারি শাকের (celery) ক্ষেতে কাজ করতে গেলুম। আমরা সবাই এক সঙ্গে কাজ করতুম আর দরকার হলে আমি দোভাষীর কাজে লাগতুম, কারণ দলের মধ্যে আর কেউ ইংরেজী জানত না।

একদিন আমরা সবাই কাজে ব্যস্ত, এমন সময় জামায় চওড়া ফিতে জড়িয়ে ও মাথায় নীল টুপি পরে একদল লোক আমাদের কাছে এগিয়ে এল কিন্তু তাদের দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে আমরা কাজ করে চললুম। ক্ষেতে-খামারে মাটির উপর যখন মানুষ কাজ করে তখন অনেক কিছুর দিকে সে মন দিতে পারে না, কাজেই আগন্তুক দলকে গ্রাহ্য না করে কাজ চলল। কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের এই আগ্রহ-হীনতায় তারা বিরক্ত হয়নি বা দমে যায়নি, কারণ তাদের মধ্যে থেকে একজন ইংরেজীতে বল্লে—ভাই, তোমার পাপের কথা কি ভেবেছ ?—

দেশী লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করলে—হতভাগাটা কি চায় বল ত ?

আমি তাদের ভাষায় তর্জ্জমা করে বল্লুম যে ও ভদ্রলোক তোমাদের পাপের কথা জানতে চান।

তারা বল্লে—আমাদের পাপ ? তাতে ওর কি দরকার—তার জন্য আমাদের পুরুত আছে, আমরা রয়েছি, ও কে ?

তারা কারা সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে লোকটা বল্লে যে তারা মুক্তি-ফৌজের (Salvation Army) লোক। আমি আমার দলের লোকগুলোকে বোঝালুম যে ওরা নির্ব্বাণের জন্য লড়াই করছে, ওরা নির্ব্বাণ-সেনানী।

মজুররা একসঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়াল, তাদের হাত থেকে যন্ত্রগুলো আপনা-আপনি খসে পড়ল, ঠিক যেন তারা অন্ধকারে ভূত দেখে চমকে গেছে।

মুক্তি-ফৌজের লোকটি বল্লে—তোমাদের জন্য আমরা শান্তি এনেছি।

মজুরদের আমি তা তর্জ্জমা করে জানালুম। একজন মজুর বল্লে—ওরা তো নির্ব্বাণের জন্য লড়াই করছে তবে শান্তি কি করে আনবে? আমাদের পাপ নিয়ে ওরা কি করতে চায় বল ত?

আমি আবার সে-কথা ইংরাজীতে মুক্তি-সেনাকে জিজ্ঞাসা করলুম। সে বল্লে—যীশুর রক্তে তোমাদের সব পাপ ধুয়ে দিতে চাই।

আমি মজুরদের বুঝিয়ে বল্লুম যে এরা তোমাদের বিবি মরিয়ম (Virgin Mary) ও তাঁর ছেলে যীশুর ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে চায়।

একথা শুনেই একজন মজুর চেঁচিয়ে উঠল—ওহো হো, ইনি বুঝি আমাদের বিবি মরিয়মের ছেলের দূত—ও লোকটাকে জিজ্ঞাসা কর ত ওর নিজের পাপের সম্বন্ধে ও কি ব্যবস্থা করেছে?

আমি মুক্তি-সেনাকে তার পাপের কথা জিজ্ঞাসা করলুম এবং তার উত্তরটা এদের তর্জ্জমা করে শোনালুম—বিবি মরিয়মের ছেলে তার সব পাপ মুছে দিয়েছেন।

আর একজন মজুর একথা শুনে বল্লে—ওর যদি সব পাপ মোচন হয়েছে তবে আনন্দের গান করে বেড়াচ্ছে না কেন? ইঁদুর যেমন করে গর্ত্ত খোঁজে ও তেমন করে পরের পাপ খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন?

আমার সাধ্যমত এ প্রশ্নের তর্জ্জমা করে মুক্তি-সেনাকে শোনালুম। সে বল্লে—ভাই, আমি তোমাদের জন্যে আলো আনতে চাই।

একজন মজুর আলোর তর্জ্জমা শুনে বল্লে—ওকে বল যে আমরা বিবি মরিয়মের ছেলেকে চাই না—আমাদের নিজেদের আলো আছে।

তখন আমি বল্লুম—কিন্তু ও কিছু পয়সা চায়।

একথা শুনে মজুরের দল খুব হাসতে লাগল এবং এক বুড়ো বল্লে—ওঃ, তাহলে দেখছি, আমাদের জন্য নয়, টাকার জন্যই ও এসেছে।

এক ছোকরা বল্লে—আরে ওকে ছেড়ে দাও, যা চায় তা দিয়ে দাও, ব্যস্।

আমরা তখন কিছু চাঁদা তুলে মুক্তি-ফৌজের সৈন্যদের দিয়ে দিলুম। চলে যাবার আগে তারা আমাদের জন্য প্রার্থনা করে গেল। তা দেখে একজন মজুর বল্লে—আচ্ছা, ঈশ্বরের সঙ্গে যখন কথা কয় তখন ওরা চোখ বোজে কেন বলত ?

আর সেই প্রশ্নের উত্তরে একটা লোক হেসে বল্লে—খুব ঠাট্টা করেছ ত !

আমরা আবার কাজে মন দিলুম।

আমাদের কাজটা ছিল ভারি কঠিন, কারণ সেলারি গাছগুলোকে এক জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় পুঁতে দেবার জন্য আমাদের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সব সময় পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে তাড়াতাড়ি অনেক পথ চলতে হ'ত আর বরাবর নীচু হতে হ'ত।

এখানে উপরওয়ালাটি ছিল ভারি অদ্ভুত রকমের লোক। লোকটি ইটালীয়ান, সবক্ষণই সে গালাগালি করছে আর থুথু ফেলছে! সে ভাবত যে সবায়ের ওপর খুব তাড়া দিলেই তার কর্ত্তব্য শেষ হবে এবং এই সূত্রে আমরা একটা ফন্দি বার করলুম। যখন সে চেঁচাত আমরা তখন খুব জোরে কাজ করতুম আর যেই সে থামত আমরা কাজে ঢিলে দিতুম। ইটালীয়ানই হোক আর যেই হোক, সারাদিন কেউ আর চেঁচাতে পারে না, কাজেই আধঘণ্টা অবিশ্রাম চেঁচিয়ে কর্ত্তা সরে পড়তেন আর আমরা ইচ্ছামত ধীরে ধীরে কাজ করতুম বা বিশ্রাম করতুম। 'ঐরে আবার সে আসছে' বলে কেউ হয়ত চেঁচিয়ে উঠত

আর যতক্ষণে সে আমাদের দেখতে পেত ততক্ষণে আমরা খুব জোরে কাজে লেগে যেতুম। তাকে দেখতে পাবার আগে তার আওয়াজ পেতুম, কারণ দিনের অর্দ্ধেক সময় সে থাকত মাতাল আর বাকী সময় মাতাল নয় বলে গজগজ করত।

তাবপর গাছ থেকে ফল পাড়বার সময় এসে গেল। এ-কাজটি বেশ সুখের। ঝুড়ি নিয়ে আমরা গাছের ঘন ডালের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতুম আর মনের আনন্দে ফল পাড়তুম। গাছের চূড়ায় বসে খুব দূরে থেকে উপরওয়ালাকে দেখতে পেতুম আর সে কাছে এসে দেখত আমরা খুব কাজ করছি।

একদিন আমি একপায়ে ভর দিয়ে ফল পাড়ছি আর ঝুড়িটা প্রায় অর্দ্ধেক ভর্ত্তি হয়ে এসেছে, এমন সময় সে এসে আমার গাছের তলায় দাঁড়িয়ে গালাগালি চেঁচামেচি করতে লাগল। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে গিয়ে আমি একসঙ্গে সব কিছু করতে গেলুম। এই নাড়াচাড়ায় ফলের ঝুড়িটা সেই লোকটার মাথায় হুড়মুড় করে পড়ে গেল, আপেল ফলের ধারায় তার গালাগালি বন্ধ হ'ল এবং সবচেয়ে অদ্ভুত হ'ল যে আমিও সেই সঙ্গে পড়ে গেলুম।

আমি মাটির ওপর চিৎ হয়ে পড়ে রইলুম, ভয় হ'ল যে সে উঠে আমায় খুব মারবে, কিন্তু সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখলুম সে আদৌ না নড়ে চুপ করে পড়ে আছে তখন আমি কনুইয়ে ভর দিয়ে দেখি সে সত্যই একেবারে অজ্ঞান হয়ে আছে।—আমি সাহায্যের জন্য চীৎকার করে উঠলুম। সবাই কাজ ছেড়ে দৌড়ে এল এবং ধরাধরি করে তাকে ঘরে তুলে জ্ঞান আনবার চেষ্টায় আধঘণ্টা কাটিয়ে দিলে। ফল পাড়তে গিয়ে এর চেয়ে মজা আর কোনদিন হয়নি।

এরপর কিছুদিন জাপানীদের সঙ্গে কাজ করেছিলুম। একদিন আমাদের সেই উপরওয়ালাকে দূরে আসতে দেখে আমি সঙ্গী জাপানীদের বল্লুম—এই, কর্ত্তা আসছে, জলদি কর।

কানাগাওয়া (Kanagawa) বলে একজন জাপানী দলের মাঝ থেকে ভাঙ্গা ইংরেজীতে বল্লে—আরে, তোমার জলদি কর, জলদি কর, কোন কাজের কথা নয়। কাজ বেশী করলেই তা ফুরিয়ে যাবে আর আমাদের চাকরি যাবে, আস্তে কাজ কর, চাকরি থাকবে বুঝলে ?

স্থতরাং আমাতে ও কানাগাওয়াতে সপ্তাহের কাজ পনের দিনে সারতুম। আমাদের উপরওয়ালার চোখের সামনে আমরা খুব জোরে কাজ করতুম, কাজেই কেউ আর আমাদের দোষ ধরত না।

ফল পাড়ার পর আমরা হপ (Hop) লতার ফল সংগ্রহের কাজ নিলুম। এই সময় আমি ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের মুসলমানদের সঙ্গে কাজ করেছিলুম। তারা কথাবার্ত্তা কইত হিন্দুস্থানীতে, প্রার্থনা করত আরবী ভাষায় আর কুৎসিত গল্প-গুজব চালাতো পুস্তুতে। এই শেষোক্ত ব্যাপারে তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা অদ্ভুত একতা ছিল। পরের কাছে কিছু মাত্র প্রকাশ না করে নিজেদের মধ্যে এই কদর্য্যতায় তারা খুবই স্থখ পেত।

একবার তারা একটা কি দুটো গল্প আমায় তর্জ্জমা করে শুনিয়েছিল, তাই তাদের চাপা কিম্বা উচ্চহাসি শুনে বুঝতে পারতুম তারা কি ধরণের গল্পে মেতে আছে। তাদের একটা গল্পের নমুনা দিই :—

একজন লোক ঘর ছেড়ে বিদেশে চলে গেল। বছর দুই পরে তার স্ত্রী তাকে চিঠি দিলে যে তার একটি সন্তান হয়েছে। লোকটি খুব গর্ব্বিত হয়ে বন্ধুমহলে সবাইকে সে চিঠি দেখাতে লাগল। তারা

বল্লে—বা, তুমি এতদিন বাইরে রয়েছ, তবে তোমার ছেলে হ'ল কি করে? লোকটা কিন্তু খুব বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বল্লে—তাতে কি, আমি যে তাকে চিঠি লিখি।

এই লোকগুলো ছিল ভারি অদ্ভুত। তাদের ধর্ম্মে মদ খাওয়া নিষিদ্ধ, সুতরাং কোনও সময় কারো মদ খেতে ইচ্ছে হলে সে কোন লুকানো জায়গায় গিয়ে পিপাসা নিবৃত্তি করত। গোপনে থেকে সে যে কি করছে তা কেউ বুঝতে পারত না। আমি তাদের স্বধর্ম্মী নয় বলে আমাকে তারা বার কয়েক তাদের সঙ্গে গিয়ে মদ খাবার নিমন্ত্রণ করেছিল, অবশ্য আমায় শপথ করতে হয়েছিল যে একথা কারো কাছে প্রকাশ করব না।

ক্রমে মহরমের উপবাসের সময় এসে পড়ল। চাঁদের অস্ত থেকে উদয় অবধি তারা উপবাস করে থাকত এবং মাঝে মাঝে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সামান্য কিছু খেত। দলের মধ্যে অনেকেই গোপনে খেত; কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই না খেয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় এগার ঘণ্টা হপের ক্ষেতে কঠোর পরিশ্রম করত। অনেক সময় তারা হয়ত প্রায় দুদিন উপবাসী থাকত, অথচ তাদের তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

এই মোসলেম দলের সঙ্গে একজন মৌলবী ছিল, সে মক্কায় হজ করে এসেছে, তাই সবাই তাকে বলত হাজী। কেবল মাত্র সেই লোকটিই আরবী কোরাণ পড়তে পারত। সমান আসনে বসে কোরাণ পড়া নিতান্ত অনাচার বলে তারা শুকনো ঘাসের উপর ঘাস চাপিয়ে প্রায় আট ফিট উঁচু একটা আসন করেছিল। কোন রকমে তার উপরে উঠে হাজী কোরাণ পাঠ করত। অনেকেই মন দিয়ে শুনত, আবার বিস্তর লোক ছক পেতে চেকার (checkers) খেলত। সারাদিনই প্রায় পাঠ চলত, শুধু যখন হাজী ঘুমুত তখন বন্ধ থাকত। ভোর প্রায় চারটের সময় হাজীর তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ পেতুম,

বিশ্বাসীদের পাঠ শোনবার জন্য আহ্বান করছে এবং প্রার্থনা করছে 'আল্লা সর্ব্বশক্তিমান, আল্লা পরম দয়াবান।'

এদিকে ঘাসের মালিক তার ঘোড়াকে খাওয়াবে বলে ঘাস আস্তাবলে নিয়ে যেতে চাইলে, সুতরাং আঁটির পর আঁটি ঘাস যত কমতে লাগল উঁচু বেদী থেকে কোরাণ ততই মানুষের সঙ্গে সমান আসনে ধাপে ধাপে নেমে এল। একদিন বিকেলে দুজন আমেরিকানকে আমরা হাজীর পাঠ শোনাতে নিয়ে এলুম। এই খৃষ্টান দুজন হাজীর অনুমতি না নিয়েই গ্রন্থ বন্ধ করে দিয়ে ঘাসের স্তূপ থেকে হাজীকে নেমে আসতে বল্লে এবং কোরাণের তলা থেকে সব ঘাস সরিয়ে দিলে। বিশ্বাসী মোসলেম দল ভয়ানক সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ; কিন্তু তারা করবেই বা কি ? তারা এই খৃষ্টানদের সঙ্গে লড়াই করতে রাজী ছিল, কিন্তু খৃষ্টানদের সঙ্গে রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্র ছিল আর তারা একেবারে নিরস্ত্র। কাজেই তারা চলে গেলে অন্য জায়গা থেকে ঘাস সংগ্রহ করে নতুন বেদী তৈরী করে তার ওপর কোরাণ ও হাজীকে পুনঃ স্থাপনা করলে। আবার পাঠ চলতে লাগল।

তাদের ধর্ম্মে হিন্দু বা খৃষ্টানদের কোন ক্ষমা আছে কিনা হাজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে—না, তলোয়ারের ডগার তলা দিয়ে তাদের যেতে হবে এবং তাদের আত্মা অনন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে।

আমি বল্লুম—খৃষ্টানরাও হিন্দু আর মুসলমানদের সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলে।

সে বল্লে—তা ঠিক, তবে খৃষ্টানদের দেবতা শুধু শাসায় আর আমাদের দেবতা তা কাজে করেন, অতএব অবিলম্বে তুমি নিজের কল্যাণের জন্য মুসলমান হও।

আমি বল্লুম—দেখ, তোমাদের মধ্যে যারা স্বর্গে যায়, তাদের কি হয় ?

তারা স্বর্গসুখ ভোগ করে। আমি আশা করেছিলুম হাজী ইন্দ্রিয় ভোগ্য স্বর্গসুখের বর্ণনা দেবে। সে বরং একটি আত্মোৎকর্ষের শান্তিময় স্থানের বর্ণনা দিলে।

আমি বল্লুম—এই স্বর্গে কি ঈশ্বরের মুখ দেখতে পাব?

সে বল্লে—না, ভগবানের সেই গৌরবময় স্থানেও আমাদের মুখ নীচুতে ধূলোর দিকেই থাকবে, কারণ তিনি যে আল্লা, পরম রুদ্র।

অবশেষে উপবাসের কাল শেষ হয়ে উৎসবের দিন এল। মুসলমানেরা মার্কিন কসায়ের মাংস কেনে না, কারণ যে জানোয়ার গলা না কেটে মারা হয় তার মাংস তারা খাবে না। অতএব নিজেরা তিনটে খুব বড় ভেড়া কিনে, বিস্তর প্রার্থনা আর স্তব করে তারা সেগুলোকে জবাই করলে। বেচারা জানোয়ারগুলো মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ ছটফট করল আর জোরে রক্তস্রাব হয়ে মাটি ভিজে গেল।

হাজীকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমরা এমন করে জানোয়ার কাট কেন?

সে বল্লে—আমাদের প্রভু এমনি করেই কেটেছিলেন কোরাণে এ কথা আছে। সে আরও বল্লে—আমরা কখনও এসব প্রশ্ন করি না, এমনি করে জবাই না করলে কখনও কোন জিনিস আমরা খাব না।

সে-রাত্রে পরম আগ্রহে তারা আকণ্ঠ ভোজন করলে। ভূরি-ভোজন শেষে টিন ক্যানেস্তারা বাজিয়ে তারা সারারাত গানের জলসা চালাল। তাদের সব গানের ছিল এই একটি মাত্র ধুয়া—চিতা বাঘের ছায়ার মত কাল তোমার চুল; বাজপাখীর ডানার মত বাঁকা তোমার ভ্রূ।

মনিবকে ফাঁকি দেবার খুব একটা মৌলিক ও অদ্ভুত ফন্দি বার করেছিল এই মুসলমানেরা। তাদের ধর্ম্মে মিথ্যা বারণ, তাই তারা কোন হিন্দু বা খৃষ্টানকে দিয়ে তাদের খাতা লেখাত এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর কাজ সারা হলে দেখা যেত তাতে চল্লিশজনের নাম ও কাজের

হিসাব আছে, অথচ বাস্তবিক কাজ করেছে মাত্র ত্রিশজন।

একদিন হিসাব-নবিশকে জিজ্ঞাসা করলুম—এ-রকম সব লেখ কেন? সে বল্লে—মিথ্যে না বলবই বা কেন? আমি যদি না করি অপরে এ-কাজ করবে আর আমার প্রাপ্য মাইনেটি দিব্যি তার হাতে যাবে!

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই একটি স্থচতুর মুসলমান এসে দলে ভিড়ল এবং এরা হিন্দুকে ছাড়িয়ে তার হাতে খাতাপত্র তুলে দিলে। এই মুসলমানটি ত্রিশজনের জায়গায় চল্লিশজনের হিসাব কোনদিনই লেখেনি। তার ফন্দিটা আর একটু নতুন ধরণের। সে মিথ্যা বলতে পারে না, অথচ ভাল ইংরেজীও জানে না বলে সে ওভারসিয়ারের (overseer) সঙ্গে এ-সম্বন্ধে সব কথা কইত, আর ওভারসিয়ার তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী থেকে তার যা মানে বুঝত তাতেই দু পক্ষের কাজ চলে যেত। নিজের পক্ষের স্থবিধা থাকলে ওভারসিয়ারের ভুল ভাঙ্গবার সে কোন চেষ্টা করত না, বহুৎ সেলাম পুরঃসর সে কথায় সায় দিত এবং জগতে এমন ওভারসিয়ার খুব বিরল যে সেলামের গোলাম নয়।

এই ধরণের জুয়াচুরিকে আমরা বলতুম 'মুনাফা'; আর হিসাব-নবিশের নাম দিয়েছিলুম 'মুনাফাদার'। একথা খুবই সত্য যে, আমাদের এই মুনাফাদার লোকটি ছিল অতি ধার্ম্মিক। দিনে সে নিয়মিত পাঁচবার নমাজ পড়ত, কোনদিন একটিও ভুল হ'ত না এবং কোরাণ ও হাদিসের রীতি অনুসারে সে চলত। শীঘ্রই সবাই তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে। ফলে দেখলুম তারা এগারোর বদলে দশঘণ্টা কাজ করতে শুরু করেছে আর মনিবের পয়সায় ঘণ্টাখানেক নমাজে কাটছে।

এই হপের ক্ষেতে কাজ শেষ করে আমরা যখন অপর জায়গায় গেলুম, দলের নমাজের বহর দেখে মনিব বল্লে—দেখ, তোমরা যদি এই নমাজ বাদ দাও তবে ঝুড়ি পিছু কয়েক সেণ্ট বাড়িয়ে দেব। তারা সবাই তাতে রাজী হয়ে দিনে পাচবারের বদলে তিনবার নমাজ করতে লাগল।

১৭

কলেজ খোলবার প্রায় সপ্তাহ তিনেক আগে ক্ষেতের কাজ ছেড়ে বন্ধুদের সন্ধানে শহরে ফিরে গেলুম। সেখানে যেতেই জেরী বল্লে যে কোন হিন্দুকে একজন স্ত্রীলোক বিনাভাড়ায় একটা ঘর ছেড়ে দিতে রাজী আছে। আমি সেই কথামত স্ত্রীলোকটির কাছে গেলুম এবং সত্যই সে তার বাড়ীতে বিনাভাড়ায় আমায় একটা ঘরে থাকতে দিলে; এবং উপরন্তু বল্লে যে, যদি আমি হিন্দু-পোশাক পরে দিনে একঘণ্টা করে তার বৈঠকখানায় বসি তাহলে আমায় অমনি খেতেও দেবে। তার এই সহৃদয়তায় আমি খুব অভিভূত হয়ে গেলুম। যখন খুশী আমি বাইরে যেতুম বা বাড়ীতে আসতুম, কোনদিন স্ত্রীলোকটি তাতে সামান্যমাত্র আপত্তি করেনি।

এর ফলে আমার বন্ধুদের সঙ্গ পাবার খুবই সুবিধা হ'ল। তারা তখন বের্গসঁর (Bergson) দর্শন আবিষ্কার করেছে এবং উইলিয়াম জেমসের (William James) বইও পড়ছে। স্বাধীন ইচ্ছা প্রভৃতির অনন্ত আলোচনায় আমরা একেবারে মেতে উঠলুম।

সন্ধ্যার পর প্রতিদিন বাড়ী ফিরে দেখতুম বৈঠকখানার দরজা বন্ধ আর ভিতরে কারা চুপিচুপি কথা বলছে। প্রতিদিন সকালে হিন্দু-পোশাক পরে বৈঠকখানায় আমি ঘণ্টাখানেক বসতুম। অবশেষে

আমার সন্দেহ জাগতে আমি বাড়ীওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার জন্য আর কিছু করতে পারি কি ?

সে বল্লে—কেউ যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে তুমি এখানে কি কর, তাহলে তুমি তাদের জানিয়ে দিও যে তুমি প্রমাণ কর।

তার কথার মানে কিছু না বুঝতে পেরে সবিস্ময়ে বল্লুম—প্রমাণ করি ?

সে বল্লে—হঁ্যা, প্রত্যক্ষ কর, বুঝলে ?

কি প্রত্যক্ষ করি ? আমি ক্রমেই রহস্যজালে জড়িয়ে পড়লুম।

সে বল্লে—আরে, তুমি ত জান, সেই যে তোমাদের পুরানো দেশে যা-সব কর।

আমাদের দেশে আবার কি করি ?

বুঝছ না—আত্মা ?

আমি বল্লুম—কি আত্মা ?

সে বল্লে—আরে, মৃতের আত্মা—বুঝছ না ?

খুব বিস্মিত হয়ে আমি বল্লুম—এ বাড়ীতে কি সব হচ্ছে বল ত ?

হাত নেড়ে সে বল্লে—তুমি বুঝছ না ? জেরী কি তোমায় কিছু বলেনি ?

আমি বল্লুম—কই না, কিছু ত বলেনি !

স্ত্রীলোকটি বল্লে—আমরা এখানে আত্মা নামাই আর তার কাছ থেকে বাণী সংগ্রহ করি।

আমি বল্লুম—তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে তুমি স্পিরিচ্যুয়ালিষ্ট ? সে বল্লে—নিশ্চয়ই, তুমিও তো, নয় ?

আমি বল্লুম—আমার ত তা বলে মনে হয় না।

সে জেদ করলে—প্রত্যেক হিন্দুই তাই, স্পিরিচ্যুয়ালিজম ত ভারতবর্ষ থেকে এদেশে এসেছে।

আমি প্রতিবাদ করলুম—তুমি কেমন করে জানলে যে এ জিনিস ভারতের? অবশ্য কয়েকজন খুব সন্দেহজনক লোক ছাড়া আমি কারুকে কোনদিন সেখানে এসব করতে দেখিনি।

সে বল্লে—কিন্তু আমেরিকায় ভদ্রলোকেরাই করে থাকে, তারা আমার মত সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি ঠিক বলছ যে তুমি সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক?

একটুও না রেগে সে বলে উঠল—হরি, হরি, এও কি একটা কথা! যাই হোক, দেখ, এই বাড়ীতে আজ বাত আটটার সময় প্রেতবাদীদের বৈঠক বসবে, মিডিয়ামও (যাকে প্রেত আশ্রয় করে) আসবে। তুমি ঠিক সময়ে এস বুঝলে।

সুতরাং রাত আটটার সময় আমি মজলিসে যোগ দিলুম। এখানে যারা আসে তাদের সবাইকে দেখলুম। বেশীর ভাগ লোকই একেবারে নিরেট আর তাদের অন্ধ বিশ্বাসও জমাট রকমের। মিডিয়াম টেবিলের উপর শুয়েছিল আর আমরা তাকে ঘিরে বসেছিলুম। হঠাৎ আমার মাথায় এক চাঁটি দিয়ে কে বল্লে—এই লোকটা সন্দেহ করছে।

আর একজন বল্লে—উনি আমাদের হিন্দু ভাই।

আমি বল্লুম—সন্দেহ করব কেন, আমি বিশ্বাস করছি।

তখন মিডিয়াম বল্লে—আমি তোমার মায়ের আত্মা। দেখ, বাড়ীর সেই হলদে চোখ বেড়ালটার কথা তোমার মনে আছে?

আমি বল্লুম—তুমি যদি আমার মায়ের আত্মা হও তবে বেড়ালের কথা বলছ কেন?

মিডিয়াম বল্লে—তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আমি বাড়ীর কোন কিছুই ভুলিনি। তুমি কি জানতে চাও, বল?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—এই মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষে আমাদের বাড়ীতে কি হচ্ছে জান?

মিডিয়াম বল্লে—সবাই শুয়ে পড়েছে।

আমি বল্লুম—না, ঠিক তার উল্টো; তারা সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠছে; যে যার কাজে যাচ্ছে।

এই সময় আমার মাথায় আবার কে এক ঘা খুব জোরে মারলে। আলোগুলো জ্বলে উঠল; মিডিয়াম বল্লে—আত্মা কথা বলতে অস্বীকৃত হয়েছেন।

আমার বোকামি ও অবিশ্বাসের জন্য আমি ক্ষমা চাইলুম, বল্লুম যে আমি সত্যই বিশ্বাস করি। তবে এ সবের কোন দরকার আছে বলে ত মনে হয় না। আমি আরও বল্লুম, যে-আত্মা অনন্তের খবর রাখে সে এসে কিনা বেড়ালের কথা বলতে লাগল, বেড়ালের কি দরকার শুনি?

তখন তারা বল্লে—কিন্তু তুমি একটা ভদ্র প্রশ্নের জবাব দিলে না কেন বলত?

আমি জেদ করে বল্লুম—তোমাদের আত্মা কিন্তু ভুল বলেছে।

মিডিয়াম বল্লে—তা বলে আত্মার কথায় প্রতিবাদ করা তোমার উচিত হয়নি।

যাই হোক, আমায় ছেড়ে দিয়ে তারা মজলিস চালাতে লাগল। পরদিন সকালে আমি যথারীতি মাথায় পাগড়ী বেঁধে বসে আছি এমন সময় একটি স্ত্রীলোক বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। তার পোশাক-পরিচ্ছদ খুব ভদ্র এবং চল্লিশের কাছাকাছি, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় বলে জানালে।

ঘরে এসেই সে বল্লে—মনে পড়ে?

অবাক বিস্ময়ে তার দিকে আমি চেয়ে রইলুম, সে আবার বল্লে—মনে পড়ে কি?

সে আমায় কি স্মরণ করিয়ে দিতে চায় মনে মনে তার বিস্তর আলোচনা করেও, ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলুম--কি মনে পড়ে ?

সে স্মিতমুখে বল্লে—বাঃ, প্রথমবারে আমরা দুজনে ব্যাবিলনে (Babylon) ছিলুম, তুমি ছিলে মন্দিরের পুরোহিত আর আমি ছিলুম দেবদাসী, মন্দিরের নর্ত্তকী। এবার মনে পড়েছে ? আমার সর্ব্বনাশ করে, আমায় তুমি রাস্তায় দূর করে দিলে এবং সেই প্রতিহিংসায় তোমায় আমি হত্যা করলুম। আমাদের গত জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমরা দুজনেই আবার এ পৃথিবীতে এসেছি। এবার সব কথা মনে হচ্ছে ত ?

তার প্রশ্নের উত্তরে আমি তাকে একটা প্রশ্ন করলুম—এই ব্যাবিলনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে তুমি ঠিক জান ?

সে বল্লে—ঠিক জানি ? বাঃ, সেদিনের মজলিসের আধ-আলো অন্ধকারে তোমায় দেখে বাড়ীতে এসে স্বপ্নে গতজীবনের সমস্ত কাহিনীটা আমার চোখের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। আজ তোমায় জানাতে এসেছি যে তোমায় আমি ক্ষমা করেছি—বল, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ ?

আমি তাকে বল্লুম—এসব নিছক পাগলামি।

সে বল্লে—দুষ্টুমি কোরো না; তোমায় আমার বেশ মনে আছে। তুমিই আমায় ভাল বেসেছিলে, তোমার উপর আমার কোন দরদ ছিল না। কিন্তু এখন তোমায় ক্ষমা করেছি। পরলোকে এই অতীত পাপের কলঙ্ক থেকে তুমি মুক্তি পাবে। স্বপনে এসব আমি ঠিক জেনেছি, তাই তোমার কাছে মন খুলে বলতে এসেছি। আসি ভাই। আমি পুরোমাত্রায় প্রেতাত্মাবাদী নই কারণ আমি পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাস করি।

কথার শেষে আমার কপালে একটা চুম্বন দিয়ে সে দ্রুতপদে ভারী গাউনের ভরা পাল তুলে যেন ভেসে গেল।

সবচেয়ে বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে। রাত প্রায় এগারটার সময় দরজায় ঘা দেবার শব্দ পেলুম—তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে ফেল্লুম। কিছু দেখতে পেলুম না; কাজেই আবার গিয়ে শুলুম। সবে শুয়েছি আবার সেই দরজায় ঘা মারার শব্দ হ'ল। আবার দরজা খুলে দেখলুম, কেউ কোথাও নেই; এবার অন্ধকারে নিঃশব্দে জামা-কাপড় পরে বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম—যেই সেই শব্দ হ'ল আমি দৌড়ে দরজা খুললুম কিন্তু কিছুই দেখলুম না।

চৌকাটের উপর দাঁড়িয়ে যখন চারদিক দেখছি তখন মনে হ'ল কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসছে। সে বাড়ীওয়ালী, আমায় দেখেই বল্লে—এসো, এসো শীগগীর, আত্মা তোমায় ডাকছেন!

আমি বল্লুম—আমায় ডাকছেন কেন?

আমি জানি না, তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাইছেন, নীচে এস। কথাগুলো এত ব্যগ্রভাবে চাপা গলায় বল্লে যে আমি অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। তারা যে ঘরে মজলিস করছিল, সেখানে তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হলুম।

সে ঘরের মধ্যে আমি বিশেষ কিছুই দেখতে পেলুম না– একটা আধ-আলো অন্ধকারে সব জিনিসই যেন অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঘরের ছাদ থেকে একটা স্বর বলছিল—তোমায় আমি বলছি যে আর কখনও সন্দেহ কোরো না। এতদিন যেসব রহস্য তোমার কাছে গোপন ছিল, সেসব আজ প্রত্যক্ষ কর। অতএব কাল থেকে তোমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে বিশ্বাস রেখো এবং সমগ্র মানবজাতিকে অজানার পরিচয় দিও। স্বর এইবার থামল।

ভক্তি-গদগদ একটা অস্পষ্ট ধ্বনি এই অশরীরী বাণীকে অভিনন্দিত করলো। তারপর আলো জ্বলে উঠল, দেখলুম ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের চারিদিকে জন বারো লোক বসে আছে।

আমি বল্লুম—আমায় তোমরা ডাকলে কেন?

তারা আমায় জানালে—এই আত্মা তোমায় তাঁর বাণী শোনাতে চেয়েছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তোমরা কেউ উপরে গিয়ে আমার ঘরের দরজায় তিনবার ঘা দিয়েছিলে? পর পর তিনবার আমার দরজায় কে ঘা দিলে অথচ আমি সেখানে কারুকে দেখতে পেলুম না।

এ কথায় খুব খুশী হয়ে তারা আমায় আশ্বাস দিলে যে, প্রায় ঘণ্টাখানেকের উপর তারা কেউ ঘর ছেড়ে বেরোয়নি

তারা বল্লে—তিনি আত্মা।

আমি এবার বাড়ীওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করলুম—আমায় ডাকবার জন্য তোমায় কে আমার ঘরে পাঠিয়েছিল?

সে আবার বল্লে—আত্মা নিজে; এবার বিশ্বাস হ'ল ত, কেমন?

আমি স্বীকার করলুম—হ্যাঁ, বিশ্বাস হ'ল; কিন্তু এসব জিনিসে বিশ্বাস করে ফল কি? আমি ত কোনদিন বলিনি যে আমি অবিশ্বাস করি।

বাড়ীওয়ালী আমায় জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমরা মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকি?

আমি যে বিশ্বাস করি সে কথা জানিয়ে বল্লুম কিন্তু এই আত্মার মত যদি বাঁচতে হয় তবে মৃত্যুর পরের জীবনের কোন গৌরব দেখি না ত।

তারপর আমি তাদের গীতা থেকে তর্জ্জমা করে শোনালুম যে আত্মা কোনদিন জন্মপরিগ্রহ করেনি, কোনদিন তা মৃত্যুর পরিচয়ও

পাবে না। অস্ত্রে আত্মাকে ছেদন করা যায় না। মানুষ যেমন করে জীর্ণ বাস ত্যাগ করে আত্মা তেমন জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে—শাশ্বত এই আত্মা, ঈশ্বরের মত চিদাত্মক এই আত্মা—অসীম অব্যয়।

আমরাও এই কথা সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করি—তারা সবাই বলে উঠল।

আমি বল্লুম—তোমরা যদি এই সবে বিশ্বাস কর তবে পাপোষ, ভাঙ্গা ছড়ি, হলদে বেরাল এই সবের মত আত্মার সাধারণ আলোচনা কর কি করে?

আমার কথার কেউ কোন সন্তোষজনক উত্তর দেবার আগেই আলোগুলো আবার নিভে গেল—আমরা সবাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলুম। একটা স্বর বললে—আমি লিয়োনার্ডো দ্য ভিঞ্চির (Leonardo de Vinci) আত্মা। তোমরা যদি কিছু জানতে চাও প্রশ্ন কর?

এই আদেশের পর দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ হ'ল একটি কিশোরীর প্রশ্নে—আমি একজন চিত্র-শিল্পী। আপনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন আমি কেমন করে বিখ্যাত হতে পারি?

লিওনার্ডোর কণ্ঠে উত্তর এল—তোমার বিখ্যাত হবার প্রয়োজন নেই।

একজন পুরুষের গলা শোনা গেল—অ্যালকেমি (alchemy) সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবেন কি?

লিয়োনার্ডো উত্তর দিলে—আমার রচনাবলীতে সব কথা আছে।

তারপর আর একজন প্রশ্ন করলে—আপনি দান্তেকে (Dante) দেখেছেন?

লিওনার্ডো বল্লে—এই মাত্র স্বর্গে তাঁকে দেখে এলুম।

একটি স্ত্রীলোক প্রশ্ন করলে—সেকশপীয়ার কোথায় আছেন আপনি কি তা জানেন?

তিনি যেখানেই থাকুন তাতে কিছু এসে যায় না,—লিওনার্ডোর কণ্ঠে এই উত্তর শুনে মনে হ'ল তিনি বিরক্ত হচ্ছেন।

তারপর শিল্পী কিশোরী আবার প্রশ্ন করলে—আমি কি আঁকব দয়া করে তা বলবেন?

লিওনার্ডো বল্লে—তোমার চিন্তা দিয়ে ছবি ফুটিয়ে তোল।

অশ্রু-সজল-কণ্ঠে কিশোরী বল্লে—আমি তাই করি, কিন্তু ছবিগুলো কি বিশ্রী দেখায়।

লিওনার্ডো তার উপর বিরূপ হয়ে উঠল, বল্লে—ও আমায় বিরক্ত করছে।

কে একজন বল্লে—আপনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন, নরক বলে কিছু আছে কি?

কর্কশকণ্ঠে লিওনার্ডো বল্লে—না।

তাহলে স্বর্গ আছে ত—একজনের এই প্রশ্নের উত্তরে লিওনার্ডো কেবলমাত্র স্বীকারোক্তি করলে—হ্যাঁ।

আমি এবার জিজ্ঞাসা করলুম—নরক না থাকলে স্বর্গ থাকবে কি করে? এবং এই প্রশ্নের জন্য মাথায় এক বিষম চাঁটি পেলুম। আবার আলো জলে উঠল, লিওনার্ডো অন্তর্হিত হলেন। কারণ আমি নাকি তাঁকে অপমান করেছি।

এরা আমায় জিজ্ঞাসা করলে, আমি এইসব মানি কি না।

আমি বল্লুম—নিশ্চয়ই মানি, তবে এর দরকার কি বল ত?

তারা গম্ভীরভাবে বল্লে—দরকার বিলক্ষণ আছে।

এইবার মজলিস ভাঙ্গল। অবশ্য আজ পর্য্যন্ত আমি এর প্রয়োজনীয়তা কিছুই বুঝতে পারিনি।

পরদিন বাড়ী থেকে বাইরে যাচ্ছি এমন সময় একজন পুলিশ অফিসার আমায় বল্লে—দেখ তুমি কি এখানে গণকগিরি কর নাকি?

খুব সাবধানে থেক, শীগগীর এ বাড়ীতে পুলিশ আসবে। আমরা মনে করি এটা একটা জুয়োর আড্ডা।

আমি তাকে বল্লুম—তার চেয়েও খারাপ, টাকা-পয়সা নয়, এরা অজানাকে নিয়ে জুয়া খেলে।

সে বল্লে—এ দলের তুমিই না প্রধান পাণ্ডা? সবাই ত মনে করে যে তুমি একজন হিন্দু যোগী। তুমি অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ত্রিকালের কথা সব বলতে পার। তুমি সব মৃত আত্মাদের সঙ্গে কথা কও। তুমি লোকের ভাগ্য-গণনা কর। কিন্তু আমার মনে হয় ওসব কিছু নয়, এটা একটা জুয়ার আড্ডা। আচ্ছা, আমার কথা শোন, আজ রাত্রে আর এ বাড়ীতে এস না। পুলিশ এখানে খানাতল্লাসী করবে।

আমি তখন সোজা জেরীর কাছে গিয়ে বল্লুম—তুমি ত বেশ লোক, মরতে আমায় অমন জায়গায় থাকতে দিয়েছিলে কেন বল ত?

জেরী বল্লে—তুমি বেশ মজায় থাকতে পাবে বলেই বলেছিলাম। ওরা এক দল প্রেতবাদী আর ভারতবর্ষই হচ্ছে এইসব ভুতুড়ে জিনিসের জন্মভূমি। তাই মনে করেছিলুম হিন্দু বলে তুমি ওদের সামান্য সাহায্য করতে পার। তুমি ওখানে থাকতে বলে ওদের মক্কেল বিস্তর বেড়ে গিয়েছে। তুমি ওখানে থাকাতে ওদের দাবী সত্য বলে প্রমাণ হয়ে গেছে যে ওরা যা বলে তা কাজেও করতে পারে। এই লোকের বিশ্বাস আর লোকে ভাবে তুমিই ওদের পাণ্ডা।

পুলিশ আমায় যা যা বলেছিল তখন জেরীকে সব বল্লুম।

যাও এখনি তোমার জিনিসপত্র নিয়ে ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়, এই উপদেশ দিয়ে জেরী বল্লে—তোমার উপস্থিতিতে আত্মারা বাস্তব এবং সম্মানার্হ হোন বা না হোন তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তোমায় কয়েদখানার গারদের ওপারে দেখা আমার পক্ষে মোটেই সুখের নয়।

সুতরাং আমি প্রাণপণে সেই বাড়ীর দিকে ছুটলুম কিন্তু পুলিশ আমার আগেই সেখানে হানা দিয়েছে। একজন পুলিশ অফিসার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিল আর দুজন বাড়ীওয়ালীকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছিল। ব্যাপার দেখেই আমি গা ঢাকা দিলুম। পর সপ্তাহে আবার যখন সে বাড়ীতে আমার জিনিসপত্র নিতে এলুম তখন বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে দেখা। সে আমাকে যথেষ্ট গালাগালি করলে! সে বল্লে—আমরা ভদ্রলোক, আমরা ত আর জুয়াড়ী নই, কাজেই পুলিশ সন্দেহজনক কোন কিছুই এখানে পায়নি। তোমায় আমরা ঘর দিলুম, খেতে দিলুম, আরামে থাকতে দিলুম, আর তুমি কিনা স্বচ্ছন্দে আমাদের সঙ্গে শয়তানী করে পুলিশে খবর দিলে! ছিঃ ছিঃ! পুব দেশের সব লোকগুলোই এক রকম। এই কথা বলে সে আমার পুঁটুলিটা গায়ে ছুঁড়ে দিলে।

এমনি করেই সেখান থেকে বিদায় নিতে হ'ল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি বুঝতে পারলুম না, সে রাত্রে কে আমার ঘরের দরজায় তিন বার ধাক্কা দিয়েছিল।

যাই হোক, এই অভিজ্ঞতায় আমার জ্ঞান জন্মাল যে খৃষ্টের সময়ে লোকেরা যেমন বিনা দ্বিধায় সব জিনিসে বিশ্বাস করত এই বিংশ শতাব্দীতেও তাদের সে প্রবৃত্তি অটুট আছে। ঈশ্বরের পুত্র যদি আজ আবার পৃথিবীতে আসেন তাহলে আজও তারা তাঁর কাছে অলৌকিক ব্যাপার আর যাদু মন্ত্র প্রভৃতির আশা করবে। বেশীর ভাগ লোকই ঈশ্বরের মহত্তর গৌরব আধ্যাত্মিকভাবে আজও আদৌ বুঝতে পারে না, তারা চায় যাদু, মন্ত্র, ভৌতিক কাণ্ড। মন দিয়ে যা পরিমাপ করা যায় না, বাক্যে যার পরিমাণ হয় না, সেই ভূমার সর্ব্বব্যাপী গভীর স্থিতি খুব কম লোকেই উপলব্ধি করতে পারে।

১৯

এ বছর কলেজে সোশিয়ালিজম চর্চ্চার জন্য একটা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করা গেল। আমাদের কার্য্যতালিকা প্রায় ঠিক করে এনেছি এমন সময় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মাণ্ডলিকেরা আমাদের ডেকে বল্লেন যে মানসিক উন্নতির জন্য এ ধরণের ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে আমরা স্ববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি এবং তাদের পুনঃ পুনঃ উপদেশ এই যে আমরা যেন সব দিক ভেবে চিন্তে দেখি, তাড়াতাড়ি যেন কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছই।

এ পরামর্শটুকুর কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল কিনা তা আমি ঠিক জানি না কিন্তু আমার খুব মনে হয় যে ভারতবর্ষের মত মার্কিন ছাত্রদেরও এমন করে শিক্ষা দেওয়া হয় না যাতে বিপথগামী না হয়েও তারা উন্নত চিন্তাধারার আলোচনা করতে পারে। এ সমস্যা থেকে মুক্তির পথ কি তা আমি জানি না। কথায় বলে—জলে না নেমে তুমি সাঁতার শিখতে পারো না, কিন্তু প্রথমে জলে নামলে যেমন ডোববার ভয় থাকে তেমনি উন্নত চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে মানসিক স্থৈর্য্য হারাবার ভয়ও যথেষ্ট থাকে, আমূল পরিবর্ত্তনের চিন্তা ও চর্চ্চায় প্রথমে মাথা ঠিক রাখা কঠিন সমস্যা।

এ বৎসর ভয়ানক শীত পড়েছিল। চারিদিকে বেকাররা কাজের সন্ধানে ঘুরছিল অথচ কাজ আদৌ ছিল না। শহরের বাইরে প্রায় ত্রিশহাজার লোক রাতের মত মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁয়ের জন্যে পশুর মত ঘুরছিল দেখে মনে ভারী ব্যথা লাগল। অনেকবার দেখেছি লোকেরা পেটের জ্বালায় কুকুরের মত রাস্তায় জঞ্জালের টব থেকে খাবার কুড়ুতে যাচ্ছে। আমার মত বিদেশী দেখলে তারা পালিয়ে যেত। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পুরুষ সামান্য একটুকরো খাদ্যের আশায় রোদে বৃষ্টিতে সারাদিন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত।

সেদিন নববর্ষের রাত্রি। অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল আর পথ জলে ভেসে গিয়েছিল। সানফ্রানসিস্‌কো শহরের সেরা রেস্তোরাঁগুলোর কাঁচের বড় বড় জানালার ভিতর দিয়ে আমরা দেখলুম জড়োয়া গহনা আর শিল্ক-স্যাটিনে অঙ্গ ঢেকে মেয়েরা আর রাতের পোশাকে ধনী বাবুর দল পরস্পরে মদভরা গেলাস ঠেকিয়ে শুভ নববর্ষ জ্ঞাপন করছে।

বাইরে ক্ষুধার্ত্ত কিশোরী যুবতীরা অন্নের পরিবর্ত্তে দেহের বেসাতি করছিল, কিন্তু কিনবে কে? চাহিদার চেয়ে আমদানী যে বেশী হয়ে গিয়েছিল। আমি দেখলুম একজন মাতাল স্ত্রীলোক ফুটপাথ থেকে জলে-ডোবা রাস্তায় নেমে পড়ল। হঠাৎ সে ঘুরে পড়ে যেতে আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে টেনে তুল্লুম। সাহায্য করবার জন্য তাকে ধরে চলতে চলতে একটা রেস্তোরাঁর সামনে এলে সে হঠাৎ আমার হাতে একটা রূপোর ডলার দিয়ে ও অর্দ্ধ-উচ্চারিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে করতে তার মধ্যে ঢুকে গেল।

একটা বিজলী বাতির কাছে এক বাড়ীর দেউড়ীতে তিনজন লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদের কাছে গিয়ে বল্লুম—এস ভাই সব, একটা ডলার পাওয়া গেছে। প্রথমেই তারা কিছু মদ খেতে চাইলে কিন্তু আমি প্রস্তাব করলুম যে প্রথমে পঁচাত্তর সেণ্টে খাবার খেয়ে বাকি ক'সেণ্টে মদ কেনা যাবে। তখনি তারা আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'ল। লোকগুলি কাঠ চেলা করে খায়, এখন তাদের কাজ গেছে। তিনদিনের মধ্যে এই তারা দ্বিতীয়বার খেতে পাচ্ছে। অনাহারে অনিদ্রায় তাদের চোখগুলো ঠিক পাগলের চোখের মত দেখাচ্ছিল।

সেখান থেকে বেরিয়ে যখন মার্কেট ষ্ট্রীট দিয়ে বৃষ্টি মাথায় করে চলেছি এমন সময় একটি মেয়ে আমার কাছে এসে বল্লে—দেখ ভাই, আমায় একটা বিছানা দিতে পার?

আমি বল্লুম—বিছানা ভাড়া নেবার মত পয়সা আমার হাতে নেই, চাও যদি আমার বিছানা ছেড়ে দেব, কিন্তু সে ঐ খালের ওপারে।

সে বল্লে—উঁহু, আমি এইখানেই বিছানাটা চাই। তুমি যদি আমায় কিছু দাও ত, ভাড়া নিতে পারি। তাছাড়া ওপারে যেতে আসতেই তো আমার দশ সেণ্ট পড়ে যাবে।

ওপারে কাজ পাওয়া যাবে এই সব আশা দিয়ে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম। সে বল্লে—আমায় তুমি কি মনে করেছ বলত! আরে রামো! যাক তোমার নোংরা কাজ। আমায় কি দাসীর মত দেখাচ্ছে নাকি? আজ্ঞে না মশাই, আলু ছাড়াবার জন্যে আর আমায় কোন বাড়ীতে ঢোকাতে পারছেন না।

আমি বল্লুম—তাহলে কি করবে শুনি? কিন্তু তোমায় দেখে ত ওসব স্ত্রীলোকের মত মনে হয় না।

সে জবাব দিলে—তোমার ওসব স্ত্রীলোক হবার মত আমি বোকা নই। যাক, এস দেখি! লক্ষ্মীটির মত আমায় কিছু খাবার কিনে দাও ত, তখন তোমায় বলব আমি কি?

আমি বল্লুম—যারা অমনি করে নিজের কথা বলে তাদের কথা আমি কখনই শুনি না।

কথা শুনে একটু কৃপাকটাক্ষে আমার দিকে চেয়ে সে বল্লে—হরি হরি, তুমি কি বোকা! তোমার সঙ্গে কোন পরিচয় নেই বলেই আমি বলতে পারি, তুমি কি ভাবো আমার নিজের ভাইকেও আমি এসব কথা বলব?

আমরা দুজনে বসতে সে বলতে লাগল—রাত্রে যেখানে প্রেত-বাদীদের বৈঠক বসত আমিও সেখানে যেতুম। আমার কি রকম মূর্চ্ছার ভাব আসত আর আমি কত কি কথা বলতুম। সেখানে একজন লোক আমার মুখের উপর হাত চালিয়ে পাস (Pass) দেবার পর

আমার মনে কি রকম স্ফূর্ত্তি জাগত আর আমি বক বক করে বকতুম। কি যে মাথামুণ্ডু বলতুম তা আমি জানি না।

আমি তখন বল্লুম—তাহলে তুমিই সেই মিডিয়াম—তোমার কি হয়েছিল ? বাড়ীটায় পুলিশ এসেছিল না ?

সে বল্লে—হ্যাঁ, তবে কোন গোল ছিল না বলে পুলিশ কাউকে ধরেনি। তারপর তারা ও-কাজ ছেড়ে দিলে আর লোকটাও সরে পড়ল। এখন তারা ভাগ্যগণনার আড্ডা খুলেছে।

মেয়েটি আমার পাশে বসেছিল, তার দুর্দ্দশা দেখে কি করব ভেবে ঠিক করতে না পেরে বলে ফেল্লুম—তুমি যে বৃষ্টিতে একবারে ভিজে গেছ।

সে বল্লে—ও কিছু নয়, এসব আমার দুরস্ত হয়ে গেছে, রোদ উঠলে আমি পার্কে যাবো'খন, সেখানে একটা কোণের দিকে জামা কাপড় গাছের পালায় মেলে দিয়ে শুকিয়ে নেব।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি পয়সার জন্যে শুধু ভিক্ষে কর ?

কেবল তাই করি, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি আমি কেবল ভিক্ষে করি, আর কিছুই করি না। সে ব্যস্ত হয়ে কথাগুলি বল্লে ?

আমি বল্লুম—তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে, তোমার আত্মীয়-স্বজনরা কোথায় ?

সে জবাব দিলে— আমার আত্মীয় কেউ নেই। বছর তিনেক আগে একটা দুর্ঘটনায় আমার বাবা মারা গেছেন। যে লোকটার সঙ্গে মিশে মা বাবাকে প্রতারণা করেছিলেন বাবার মৃত্যুর পর মা তাকে বিয়ে করেন, আর বিয়ে করবার পরেই তারা আমায় তাড়িয়ে দিলে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলুম, একজন অল্প বয়সের সুশ্রী মেয়ে চায়। আমি দেখা করলুম এবং প্যালেস হোটেলে কাজ পেলুম—পরিবেশনের কাজ। এই কাজের সময় একটি লোকের সঙ্গে ভাব হয়, সে মৃত আত্মাদের

কথা কওয়াতে পারত। তারপর আমি ঐ দলে কাজ নিলাম কিন্তু তুমি এসে পুলিশে সব খবর দিয়ে হাঙ্গামা বাধালে; আড্ডাটি ভেঙ্গে দিলে। কাজেই এখন আর আমার কিছু নেই, পথে পথে ঘুরি আর ভিক্ষে করি।

আমি তাকে বল্লুম—তুমি যা বলছ তার চেয়ে তোমায় দুষ্টু বলে মনে হয়।

আমার মন্তব্য শুনে—আঃ, তুমি ভারী বিরক্ত কর—জাহান্নামে যাও, এই কথা বলে হঠাৎ টেবিল ছেড়ে উঠে সে রেস্তোরাঁর বাইরে চলে গেল।

তার আধ-খাওয়া খাবারের দাম দিয়ে আমিও বাইরে বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়লুম। আমার কাছে আর মোটে পনের সেণ্ট ছিল। এই জীবনের অর্থ কি এই কথা ভাবতে ভাবতে পারঘাটের দিকে এগিয়ে গেলুম। যেতে যেতে দেখি একটা প্রকাণ্ড চারপাশ বন্ধ লিমোজিন মোটরকারে সেই মেয়েটিকে একটা আধা মাতাল লোক হাত ধরে উঠিয়ে দিয়ে নিজেও তার মধ্যে ঢুকে পড়ল আর যেন ড্রাইভারকে বল্লে —হোটেল।

এই ত আমেরিকা—ভারতের চেয়ে উত্তমও নয় অধমও নয়! সমস্ত জীবন যেন একটা কুৎসিত বিদ্রূপ এবং প্রত্যেক বিদ্রূপ যেন আর একটার জঘন্য অনুকরণ। এ আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। পূর্ব্বাকাশের দিকে চেয়ে আমি ভারতের কথা ভাবতে লাগলুম।

বিশ্ব-কর্মী-সংঘের বন্ধুদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পালা এইবার ভাঙ্গল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে আমি একটি কলেজে তুলনা-মূলক সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতা দিয়ে নানাদেশ ঘুরতে সুরু করি এবং এই সূত্রে নানা রকমের ও বিভিন্ন দলের আমেরিকানের সংস্রবে আসি।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করে আমি দেখেছি যে সারা যুক্তরাষ্ট্রকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়; পূর্ব্ব, মধ্য-পশ্চিম, দক্ষিণ ও প্যাসিফিক উপকূল। পূবের দেশগুলির সঙ্গে য়ুরোপের ঘনিষ্ট যোগ আছে এবং তার ফলে মার্কিনের অন্য অংশের চেয়ে এই দিকটা একটু বেশী রকম য়ুরোপীয়। দ্বিতীয় বা মধ্য পশ্চিম নিতান্ত আত্মসর্ব্বস্ব। কারণ বাইরের কোন প্রভাবের সঙ্গে এর যোগ খুব সামান্যই। কাজেই এখান-কার কালচার বেশী মাত্রায় দেশজ ও গ্রাম্য। দক্ষিণ সম্বন্ধে কোন কিছু স্পষ্ট করে বলা বা বোঝা কঠিন। মনে হয় যেন এর উপর কাফ্রি প্রভাব কিছু বেশী কিন্তু এ ধারণা আসলে ঠিক নয় অথচ এর মধ্যে দেশজ উপাদানের কোন প্রাধান্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। উপরন্তু এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় রক্ষণশীলতার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিন্তু এই দেশের আবহাওয়ার উপর বিশ্বাস করা যায় না তবে আশা করা যায় যে দক্ষিণের স্ত্রী-পুরুষ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশোচিত সুন্দর ও ভয়ানক একটা কালচার একদিন না একদিন গড়ে তুলবেই।

য়ুরোপের কালচার অগ্রাহ্য করা পূবের পক্ষে যেমন অসম্ভব, এশিয়ার কালচারের স্রোতে বাধা দেওয়া প্যাসিফিক (প্রশান্ত মহাসাগর) উপকূলের পক্ষেও তেমন দুষ্কর। প্রাচ্যের সজ্জা-বাহুল্য ও সেই সঙ্গে প্রাচ্যের ব্যবধান রেখে চলার অভ্যাস এদেশে বিশেষ করেই চোখে পড়ে। প্যাসিফিক উপকূলের অনেক বাড়ীতেই আমি দেখেছি যে

লোকেরা সবায়ের থেকে দূরে থাকতে চায়। তারা নিজেদের চারদিকে আত্মম্ভরিতার এক চীনা প্রাচীর গড়ে তোলে। উপরন্তু এদিকে স্প্যানিস প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়; সেটাকে ঠিক য়ুরোপীয় বলা চলে না, বরং প্রকৃতিটা কাফ্রি ও স্যারাসেনিক (মুসলমানী) আচারের যৌগিক ফল।

যে সমস্ত জাতি ও সভ্যতাগত প্রভাবের উল্লেখ করলুম তারা যদি সারা যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে যায় তবে কি আশা করা যায় না যে পঁচিশ বছরের মধ্যে আমেরিকায় এমন একটা কালচার বা সভ্যতা গড়ে উঠবে যা একালে অপূর্ব্ব, সমৃদ্ধ ও মহাপ্রভাব-সম্পন্ন হবে? আমেরিকার ঐতিহ্য অতীতমুখী নয় ভবিষ্যতের। চল্লিশ শতাব্দীর ঐতিহ্য-ভার বহনকারী হিন্দুর পক্ষে মার্কিনের প্রতি টান অন্যান্য দেশ অপেক্ষা প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। য়ুরোপ হিন্দুর চিত্তকে আকর্ষণ করতে পারে না। সহৃদয় বা উদার চিত্ত হবার মত য়ুরোপ যেমন প্রবীণ নয়, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কববার মত আবার তেমন সে তরুণও নয়। য়ুরোপে গ্রীসের (Greece) বাইরে এমন কোন কিছু নেই যাতে হিন্দুর মর্ম্ম স্পর্শ করতে পারে। হিমালয়ের আকাশ-বুভুক্ষা বা ভারতীয় অরণ্যাশ্রমের ভীষণ অদৃষ্টবাদের তুলনা সারা য়ুরোপে কোথাও মেলে না। ভারতে এমন বহুস্থান আছে যেখানকার উগ্র ভীষণ নির্জ্জনতার তুলনায় প্রায় সারা য়ুরোপ এমন কি রাশিয়াও সুন্দর ও মধুর বলে মনে হয় অথচ ভারতের মাধুর্য্যের কাছে সে মধুরতা কতটুকু! সুতরাং কোন হিন্দু যদি তাঁর জাতি ও সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু দেখতে চান তবে বরং য়ুরোপ ত্যাগ করে তাঁর আমেরিকায় আসা উচিত।

এদেশের ভবিষ্যৎ ভারতের অতীতের চেয়েও ভীষণ, রুদ্র। চরম নির্জ্জনতাই আমেরিকার ভাগ্যলিপি এবং হিমালয়ের মতই এ মহাশূন্যতা

মনোহর। আমেরিকার বাতাসে আমি মুক্তির তীব্র আস্বাদ পেয়েছি—রাজনৈতিক দলের হাত থেকে মুক্তি নয়, অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে মুক্তি নয়, এ হচ্ছে মৃতের শাসন থেকে মুক্তির স্বাদ। কোন মৃত পুর্ব্বপুরুষের দল এখানে নব জাতকের দোলায় দোল দেয় না। এশিয়ার মত আমেরিকায় আমি একটি নর-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি। য়ুরোপে কিন্তু সাধারণ জীবন নর-কেন্দ্রিক। সেখানে মানুষকে দিয়েই সব জিনিসের পরিমাপ চলে। তাই য়ুরোপে যেমন একটা নর-বিতৃষ্ণা জাগে এদেশে সে ভাবটা জাগে না।

এশিয়া ও আমেরিকার মানুষের মধ্যে খুব একটা সাদৃশ্য আছে। মানুষ যেন মহাদেশের জীবন মহাবর্ত্তের একটি সামান্য ঘটনা। এ দু' দেশের লোকের চরিত্রে সে ভাবটা বেশ ধরতে পারা যায়। সে জানে যে সংসার নর-কেন্দ্রিক নয়, বিশ্ব-কেন্দ্রিক। বাতাহত প্রান্তরে মশক-দলের উড্ডয়নের মত মার্কিনে মানুষের জীবন অস্থির ও নগণ্য।

এদেশে (আমেরিকার) লোক যখন বলে যে শিল্প-সাহিত্যে মন দেবার তার সময় নেই তখন সে সত্য কথাই বলে। যে শক্তি আমেরিকাকে বস্তু-লালসার ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার হাতে মানুষ অজ্ঞান বা সজ্ঞান যন্ত্রমাত্র। সে স্বাতন্ত্র্যবাদী হলেও তার কোন ব্যক্তিত্ব নেই। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করলেও জাতিগত আদর্শকেই সে পরিপুষ্ট করে তুলছে।

আমেরিকান নারীও এই জাতিগত উদ্দেশ্যের সঙ্গে শৃঙ্খলিত রয়েছে। গৃহহীনতায় ভীষণ এই মহাদেশে তাকে ঘর বাঁধতে হয়েছে। প্রত্যেক জাতিতে পুরুষই ক্রমাগত এগিয়ে চলে আর নারী প্রাচীন ধারা বজায় রাখে। এখানে নারীর জীবনের টানা কেবলই বদলাচ্ছে এবং তার কর্ত্তব্য হচ্ছে তার মধ্য দিয়ে রক্ষণশীলতার পোড়েনের সুতোটা কেবলই জড়িয়ে দেওয়া, তা না হলে যে সব নষ্ট হবে

অন্য প্রাচীন সভ্যতাজাত নারীর মত অন্তরোৎসারিত স্থিতির শক্তিতে মার্কিন নারী আমেরিকার অস্থিরতা রোধ করতে পারছে না। তাকে আমরণ মহৎ চাঞ্চল্য সৃজন করতে হবে এবং সেই শক্তির সমতা ও স্থিতিতে হবে শান্তির উদ্ভব। এখনই মার্কিন নারী সে কাজের ভার নিয়েছে। এ কর্ত্তব্যে সে নূতন ব্রতী হয়েছে সুতরাং নানা পরীক্ষার মধ্যে, নানা ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে সে আলোর সন্ধানে চলেছে। প্রতি মাসে সে হয়ত তার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করছে, একই সময়ে হয়ত বিভিন্ন শিল্প-ধারা বোঝবার বা শেখবার চেষ্টা করছে। নিজের দেশের কুৎসা কীর্ত্তনের জন্য সে হয়ত বিদেশী সমালোচককে সমাদরে নিমন্ত্রণ করছে কিম্বা য়ুরোপের মন্দ কবিদের প্রশংসা করে প্রশ্রয় দিচ্ছে—হাস্যকর হলেও এই সব ছেলেখেলার মধ্য দিয়ে জাতীয় আত্মা নব নব রূপ পরিগ্রহ করছে—না, এ শুধু জাতির আত্মা নয়, বিশ্বের আত্মা।

আমেরিকা যেন একটা বিরাট বীজভূমি। বিপুল বিশ্বের সমগ্র জাতি তাদের সমস্ত ভালমন্দের বীজ এই বসন্ত আন্দোলিত দ্বীপে বপন করছে। এশিয়ার রহস্যবাদ, য়ুরোপের বিচিত্র রসাশ্রিত কালচার ও আফ্রিকার অজ্ঞানতাজাত সততা সবই সমান আদরে এ ভূমিতে স্থান পেয়েছে।

আমেরিকা বিজয়ী কিন্তু ভারত পর-পদানত। আমেরিকা চিন্তা-হীন, ভারত চিন্তাজীর্ণ; আমেরিকা তার নিগ্রোদের নৃশংসভাবে হত্যা করে আর ভারত তার অস্পৃশ্যদের কুব্যবহারে জর্জ্জরিত করে, আমে-রিকা আজও তমসা-গর্ভ আর ভারত তার মহাতমসার জন্মদাত্রী। আমেরিকা আত্ম-প্রত্যয়ে বলশালী কিন্তু বার্দ্ধক্যজীর্ণ ভারত নিজেকে বিশ্বাস করবার মত শক্তিহীন বা প্রবৃত্তিহীন। ভারতে জাতির পাঁতির ব্যবধান আছে কিন্তু আমেরিকার লক্ষ্য মানুষের সাম্যের দিকে। এই

দুই দেশের ঐক্য ও বৈষম্যের ধারা এমনি করে বহু বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই বৈষম্য এতই চরম যে, এই দুয়ের মিলন অবশ্যম্ভাবী। ভারত ও আমেরিকা উভয় দেশই অপ্রকৃতিস্থ। ভারত শান্তির লোভে ও আমেরিকা চাঞ্চল্যে একেবারে আত্মহারা। তাদের উভয়ের এই আত্ম-বিস্মরণ, এই উন্মাদনা আমায় আকৃষ্ট করেছে। আমার এই বুভুক্ষু হিন্দু আত্মার পক্ষে য়ুরোপে যথেষ্ট বা উপযুক্ত খাদ্যই নেই। আমেরিকার নব নব উৎপাদনী শক্তিই আমার কাম্য। চব্বিশ ঘণ্টায় যে দিন শেষ হয় তা আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়, আমি তার মধ্যে দুটো দিনের মত সমস্ত পেতে চাই।

ভারতের নাম করে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল। কলম্বাস (যাঁর নামের প্রথম কথার অর্থ হয় 'খৃষ্টবাহী—Christopher-Christ—bearer) বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের জন্য ভারতের অনুসন্ধানে অভিযান করেছিলেন কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি এক নূতন দেশ আবিষ্কার করলেন যেখানে কালে খৃষ্ট ও বুদ্ধের মিলন-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হবে। কলম্বাসের যাত্রা ভুলের মধ্যে শেষ হয়েছিল কিন্তু আগামী পাঁচশ বছরে প্রমাণ হবে যে, তাঁর ভুল দেবতাদের সত্য অভিপ্রায়েরই ছদ্মরূপ।

—শেষ—